Hothat Dekha by Sunil Gangopadhaya
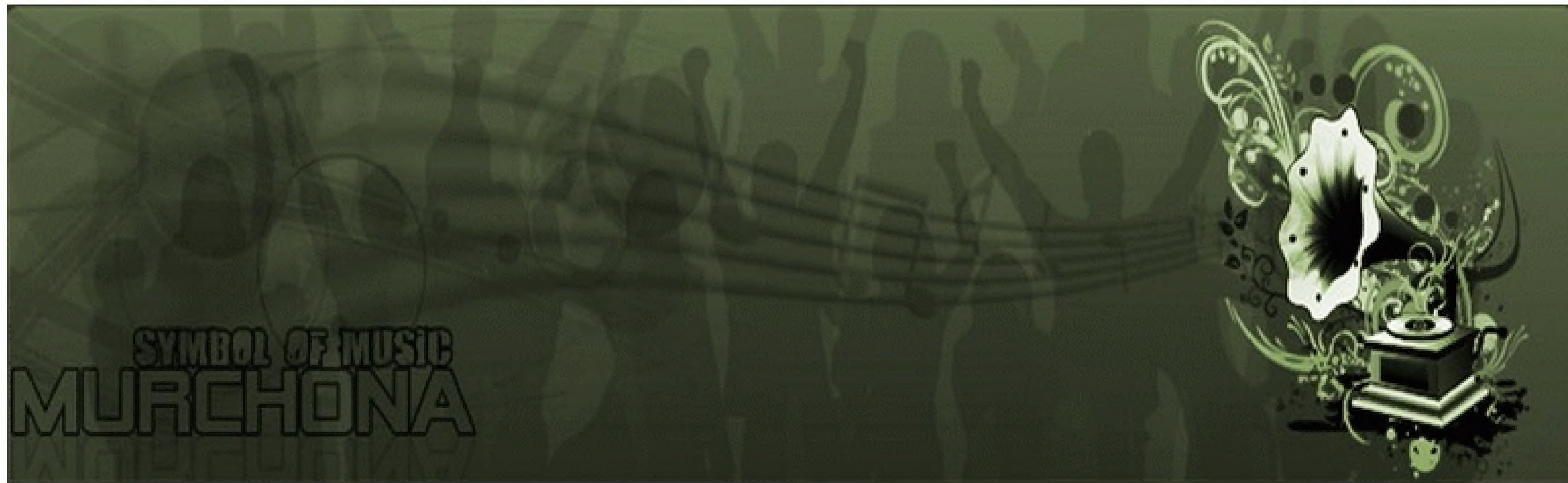
হঠাৎ দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এক

আমার এক বউদির বাড়িতে রেখা নামে একটি মেয়ে রান্নার কাজ করতো। মেয়েটি বেশ চটপটে, রান্নাও মোটামুটি ভালোই করে, তা ছাড়া বেশ নির্ভরযোগ্য। বউদিদের বাড়িতে মাছের টুকরো কোনোদিন বেড়ালে খেয়ে যায় না, দুধের কড়া হঠাৎ উল্টে যায় না, খুচরো পয়সাও যখন-তখন হারায় না। রেখার ওপর বাড়ি দেখাশুনোর ভার দিয়ে বউদিরা নিশ্চিন্তে দু'তিনদিন বাইরে বেড়িয়ে আসে।

আজকাল বাড়ির দাসী বা রাঁধুনীদের নাম আর ক্ষেন্তি, পাঁচির মা কিংবা নীরোবালা ধরনের হয় না। তাদের নাম শান্তি, সন্ধ্যা, রেখা, রমলা ধরনের প্রায় সিনেমার হিরোইনদের মতনই। অনেক বাড়ির চাকরের নাম হয় সুনীল, শক্তি বা তারাপদ।

ঐ রেখার স্বামীর নাম অবশ্য ভবসিন্ধু। রেখা সম্ভবত তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, কারণ লোকটির বয়েস যথেষ্ট বেশী, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, গেরুয়া রঙের ধুতি পরে। প্রত্যেক মাসের ঠিক এক তারিখেই লোকটি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে বসে থাকে। টিনের বাটিতে মুড়ি এবং হাতলভাঙা কাপে চা দেওয়া হয় তাকে ভেতর থেকে।

বেশ কয়েক দিন আমিও লোকটিকে দেখেছি। যে-কোনো কারণে হোক লোকটিকে দেখলেই আমার রাগ হতো। লোকটা নিজের বউয়ের রোজগারের পয়সা হাতিয়ে নেবার জন্য ঠিক প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে এসে হাজির হয়। লোভীর মতন মুখ!

স্বামীর রোজগারে স্ত্রীদের সংসার চালানোর ব্যাপরটা স্বাভাবিক, কিন্তু স্ত্রীর রোজগারে স্বামীর সংসার চালানোটা আমরা এখনো ঠিক মতন মেনে নিতে পারি নি। রেখা সারা মাস পরের বাড়িতে খাটে, আর তার স্বামী সারা মাস গাঁয়ে থেকে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, আর মাস পয়লায় ছুটে আসে টাকার লোভে। ব্যাপারটা ভাবলেই গা কিট কিট করে! সব ধর্মের বিয়ের মন্তরেই আছে, স্বামীই স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেতো যদি না পারে তাহলে লোকটা বিয়ে করেছে কেন?

বউদি রেখাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্বামী গ্রামে কি করে? কাজ টাজ করে না?

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই রেখা লজ্জা পায়। মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বালিকার মতন হাসে। যদিও বছরে ক'দিনই বা সে স্বামীসঙ্গ পায়?

যাই হোক, তার স্বামী একটু সাধু প্রকৃতির। আগে প্রায়ই সে এদিক-ওদিক চলে যেত। এখন তবু কয়েক বছর যে বাড়িতেই স্থায়ী হয়ে আছে, সেটাই রেখার পরম সৌভাগ্য। নিজেদের জমি-জায়গা সব বেহাত হয়ে গেছে, পরের জমিতে দিনমজুরি করতে তার মানে বাধে। সে এখন সাপের বিষের টোটকা আর ভূত ঝাড়ার মন্ত্র দিয়ে কখনো সখনো দু'চার টাকা রোজগার করে মাত্র। ওদের একটি আট ন'বছরের মেয়ে আছে, সে থাকে বাবার কাছেই।

এক সময় কলকাতার অধিকাংশ বাবুদের বাড়ির রান্নাঘরেই দেখা যেত ওড়িশা বা মেদিনীপুরের ঠাকুরদের। এখন বোধ হয় ঐ সব জায়গায় সাধারণ লোকদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, কিংবা তারা অন্য জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। সেই তুলনায় দরিদ্র হয়ে গেছে চব্বিশ পরগণা। কারণ এখন অধিকাংশ কাজের লোক, অর্থাৎ ঝি চাকর রাধুনী ঠাকুর আসে চব্বিশ পরগণা থেকে। এদের মাসিক মাইনে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশী হয় না। মাত্র চল্লিশ টাকায় রেখার স্বামী ভবসিন্ধু তার মেয়েকে নিয়ে কি করে সারা মাস চালায়, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বাবুদের ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স কিছুটা অন্তত বাড়ে, কিন্তু ঝি-চাকরদের মাইনে বাড়ার কোনো নিয়ম নেই। নেই বছর বছর ইনক্রিমেন্ট কিংবা পূজো বোনাস। দামি সুট আর গলায় টাই বেঁধে, মুখে ফরফরে ইংরিজি বলা যে বাবুটি রোজ অফিস যান, তিনিও যে আসলে চাকরিই করেন সেটা ভুলে যান, নিজেকে চাকর না ভেবে তিনি বাড়ির চাকরকেই ভাবেন চাকর। এই রকমই চলে আসছে।

গত তিন চার বছরের মূল্যবৃদ্ধির ছাপ পড়তে দেখেছি রেখার স্বামী ভবসিন্ধুর ওপর। লোকটা আরও রোগাটে হয়ে গেছে, চুপসে গেছে গাল, পরনের গেরুয়া ধুতিটি শতছিন্ন। আগে সে মুখ ফুটে কিছু চাইতো না, এখন সে সিঁড়িতে বসে চা আর মুড়ি শেষ করার পর খুব নিরীহ গলায় বলে, আর একটু চা হবে? বোধ হয় মাসে একবারই সে চায়ের স্বাদ পায়।

সারা বছরে রেখা ছুটি প্রায় নেয়ই না। কখনো সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেলে তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসে। বুঝতে পারি কারণটা। বাবুদের বাড়িতে তার দু'বেলার খাওয়াটা অন্তত বাঁধা। দেশে থাকলে, তার সামান্য রোজগারের টাকা তার নিজের খাদ্যের জন্যও খরচ করতে হয় যে।

একবার রেখা দেশ থেকে ফিরে এসে বউদিকে অনুরোধ করলো, তার স্বামীর জন্য একটা কাজ খুঁজে দিতে। বুঝলাম, ওরা একেবারে অভাবের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। রেখার সন্ন্যাসী স্বভাবের স্বামীও এখন খিদের জ্বালায় অহংকার ছাড়তে বাধ্য।

আমাদেরই এক চেনাশুনো বাড়িতে ভবসিন্ধুর কাজ খুঁজে দেওয়া হলো। দু'চারদিনেই মানিয়ে নিলো ভবসিন্ধু। খবর পেলাম, তার মনিবরা তার ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট, যদিও কাজ সে ভালো পারে না, হাঁটা চলা করে আস্তে আস্তে, কিন্তু লোকটি নরম সরম প্রকৃতির, সব কথা মন দিয়ে শোনে, এবং অসৎ নয়। সে বাড়িতেও বেড়ালে মাছ ভাজা খেয়ে যায় না, দুধের কড়াই ওল্টায় না। রেখার সঙ্গে তার স্বামীর এখন ঘন ঘন দেখা হয়।এই ব্যাপারটাতে আমরা সবাই স্বস্তি বোধ করি।

কয়েকদিন বাদে দেখি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়িতে একটি আট ন'বছরের মেয়ে বসে আছে। মলিন, ছেঁড়া ফ্রক পরা, অসম্ভব ভীতু ভীতু মুখ। শুনলাম, সে রেখার মেয়ে। সে আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাবা-মা দু'জনেই কাজ করতে চলে আসায়, সে বাড়িতে একলা থাকতে পারে না। চব্বিশ পরগণার কোন্ সুদূরপ্রান্ত থেকে মেয়েটি একলা ট্রেনে চেপে বিনা টিকিটে চলে আসে। সিঁড়িতে বসে কাঁদে।

একে নিয়ে এখন কি করা হবে? আমার মা-বউদিরা খুব চিন্তায় পড়ে যান। ঐটুকু মেয়েকে দিয়ে কোনো বাড়ির কাজ করানো একটা অমানবিক ব্যাপার, আমার মা-বউদির তাতে ঘোর আপত্তি। এমনি তাকে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জায়গাই বা কোথায়! সারা দিন রান্নাবান্না করার পর রেখা রাত্রে রান্না ঘরেই ঘুমোয়। মেয়েটা সারা দিন থাকবে কোথায়? তাছাড়া আর একটা অসুবিধেও আছে। ভবসিন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যদি একজনও কেউ না থাকে, তা হলে দু'দিনেই সে বাড়ি লোপাট হয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজনরাই খুলে নিয়ে যাবে জানলা দরজা। রেখা আর ভবসিন্ধু প্রথম প্রথম মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তারপর ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তবু মেয়েটি হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে। ঐটুকু মেয়ে কি করে রাত্তির-বেলাতেও একটা বাড়িতে একা থাকবে, সেটা আমরাও কেউ বুঝে উঠতে পারি না।

আড়াই মাস সার্থক ভাবে কাজ করার পর ভবসিন্ধু তিন দিনের ছুটি চাইলো। সেই সঙ্গে রেখাকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। দু'জনে গিয়ে গ্রামের বাড়ি এবং মেয়ের একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। মেয়ে রোজ খেতে যায় তার মামার বাড়িতে, সেখানেও দিয়ে আসতে হবে টাকা পয়সা।

দুই বাড়ি থেকেই এই ছুটি মঞ্জুর করা হলো। আড়াই মাস বাবুদের বাড়িতে ভালো মন্দ খেয়ে ভবসিন্ধুর এখন স্বাস্থ্য আবার ফিরেছে। তাদের স্বামী স্ত্রীকে এখন বেশ সুখী সুখী দেখায়।

যাবার আগে রেখা আমার বউদির কাছে একটা বিনীত আবেদন জানালো। যদি তাদের দুশো টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়, তা হলে তাদের মহা উপকার হবে। তারা স্বামী-স্ত্রীতে এই কদিনে দেড় শো টাকা জমিয়েছে, তাদের একটা তিন বিঘের ধান জমি বন্ধক দেওয়া আছে তিন শো টাকায়। সেই জমিটা এখন ছাড়াতে না পারলে একেবারেই গোল্লায় যাবে। ঐ দুশো টাকা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাইনে থেকে মাসে কেটে নেওয়া হবে। রেখা আমার বউদির পায়ে হাত দিয়ে সজল নয়নে বললো, বউদি, আমাদের এই উপকারটা করুন। আমরা সারা জীবন আপনার পা-ধোওয়া জল খাবো!

আমার বউদি একটু দয়ালু প্রকৃতির, অল্প কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তবু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিতে লাগলো, ওরা যদি আর না ফেরে? রেখা আমার মায়ের পা ছুঁয়ে বললো, আমি ভগমানের নামে দিব্যি করে বলছি মা, ঠিক চারদিনের মাথায় ফিরে আসব। ভোরের ট্রেনে এসে রোববার সকালে আপনাদের আমিই চা বানিয়ে দেবো।

সেই রবিবার পেরিয়ে আর একটা রবিবার ঘুরে এলো, কিন্তু রেখা আর ভবসিন্ধু ফিরে এলো না। বউদি মনে একটা দারুণ আঘাত পেলেন। দুঃখ থেকে জ্বলে উঠলো রাগ। বউদি বললেন, পুলিস দিয়ে ওদের আমি ঠিক ধরে আনবো। ওদের জেল খাটাবো! শুধু দুশো টাকার জন্যই নয়,ওরা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, এটাই বউদির সাঙ্ঘাতিক লেগেছে। তা হলে কি কোনো মানুষকে আর বিশ্বাস করাই যাবে না? বউদি রাগে একেবারে গনগন করছেন। একটা কিছু ব্যবস্থা নিতেই হয়।

আমাদের দাদা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির ঝি-চাকরদের ব্যাপর নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামান না। সব শুনেটুনেও তিনি বই থেকে চোখ না তুলে বাঁ হাতের ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, ওসব, আমি জানি না, ওসব আমি জানি না।

অগত্যা আমারই ওপর তদন্তের ভার পড়লো। ভবসিন্ধুদের গ্রামের নামটা শুধু জানা, সেটা কোথায়, তা কেউ জানে না। বোধ হয় ক্যানিং-এর কাছাকাছি কোথাও। আমি চতুর্দিকে টো-টো করে ঘুরে বেড়াই, আমার পক্ষে একটা গ্রাম খুঁজে বার করা এমন কিছুই শক্ত নয়। একদিন সকালে ক্যানিং-এর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

ট্রেনের জানলার ধারে বসে আমি ভাবতে লাগলাম, ওদের না ফেরার কারণটা কি হতে পারে? রেখা আর ভবসিন্ধু দু'জনেই বেশ সৎ, কোনোদিন চুরিচামারি করে নি। সামান্য দু'শো টাকার লোভ তারা সামলাতে পারলো না? ভবসিন্ধু না হয় আগে চাকরি করে নি, কিন্তু রেখা তার এতদিনের চাকরিটা এমনি করে হারাবে? কী লাভ এতে?

হয়তো এমনও হতে পারে, তিন শো টাকা দিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে ওদের মাথায় অন্য একটা চিন্তা এসেছে। আজকাল তিন বিঘে জমিতে, একটু পরিশ্রম আর যত্ন করলেই, অন্তত পঁয়তাল্লিশ মন ধান পাবার কথা। সেই ধানে ওদের সারা বছর চলে যেতে পারে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে নিশ্চয়ই ভেবেছে, পরের বাড়িতে চাকর-রাঁধুনি থাকার বদলে ওরা আবার চাষী হবে। ওরা থাকবে নিজেদের বাড়িতে, গড়ে তুলবে নিজেদের সংসার, ছোট মেয়েটি সঙ্গ পাবে মা-বাবার। এই তো স্বাভাবিক জীবন। অথচ যেন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নও চোখের সামনে এলে সামান্য দুশো টাকার গ্লানি এমন আর কি? হয়তো ওরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে, এক বছর-দু'বছর বা যতদিন বাদেই হোক, বউদির কাছে গিয়ে ওরা সেই টাকা ফেরত দিয়ে আসবে? যদি আমি গিয়ে ওদের এই অবস্থায় দেখি, তাহলে নিশ্চিত ওদের ফিরে আসতে বলবো না।

ক্যানিংয়ের কাছে সেই গ্রাম আর ভবসিন্ধু সাপুই-এর বাড়ি খুঁজে বার করতে আমার বিশেষ কষ্ট পেতে হলো না। একটা ময়লা ডোবার পাশ দিয়ে অতি সরু রাস্তা, তারা দু'পাশে খান চার-পাঁচ বাড়ির মধ্যে একটি ভবসিন্ধুর। বাড়ি মানে একটাই খড়ের ঘর, ছোট্ট উঠোন, তারই মধ্যে বেগুন আর লঙ্কার চাষ হয়েছে। বাড়ির সামনে কিছু এঁটো কলাপাতা পড়ে আছে, মনে হয় দু'একদিন আগে এ বাড়িতে অনেক লোক খেয়েছে।

ভবসিন্ধু আর রেখা দু'জনেই উঠোনে ছিল। ঘরের দাওয়ায় বসা আর দু'চারটি গ্রাম্য বুড়ো। কিসের যেন একটা তুমুল আলোচনা চলছিল, তার মধ্যে আমি একটা উৎপাতের মতন এসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে রেখাই ভয় পেয়ে গেল বেশী, একটাও কথা না বলে, যেন আত্মরক্ষা করার জন্যই ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ভবসিন্ধুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায়, আমার মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো, পেছনে আরও লোকজন এসেছে কিনা!

ওর ভয় ভাঙাবার জন্য আমি বসলাম। তারপর বললাম, তোমাদের অসুখ বিসুখ হয়েছে কিনা সেই খবর নিতে এলাম। আমার মা পাঠিয়ে দিলেন।

আচমকা ভবসিন্ধু হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে লাগলো। সব কথার মানেই বোঝা যায় না। অতিকষ্টে এইটুকু উদ্ধার করলাম, সে আজই যাচ্ছিল আমাদের খবর দিতে, তাদের অনেক বিপদ গেছে এই ক'দিনে, মেয়েটার অসুখ, তারপর রেখাকে আবার ভূতে ধরেছিল, তার জন্য খরচপত্র করতে হলো।আমার যদি বিশ্বাস না হয় তো আমি ঐ গ্রাম্য বুড়োদের জিজ্ঞেস করতে পারি...ইত্যাদি।

ভবসিন্ধুর হাঁকডাকে রেখা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আমাকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এসে টাস করে পড়ে গেল মাটিতে, গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো—যেন এখনো তাকে ভূতে ধরে আছে।

একটু পরে আমি ভবসিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, জমিটা ছাড়ানো হয়েছে?

সে আবার কেঁদে ফেলে বললো, না বাবু, হলো নি, জমি আমার ভাগ্যে নেই,টাকা পয়সা সব বেইরে গেল, যেমন কপাল করে এয়েচি,আবার সর্বস্বান্ত...

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলাম। হায় স্বপ্ন। আমি ভেবেছিলাম, ওরা ঝি চাকরের কাজ ছেড়ে আবার চাষী হবে! রেখাকে ভূতে ধরেছে ঠিকই। তবে একটা ভূত নয়, পাঁচটা ভূত। পাঁচ ভূতে ওদের টাকা লুটেপুটে নিয়েছে!

দুই

সকালবেলা খবরের কাগজ সহযোগে চা-টোস্ট নিয়ে বসেছি টেবলে, হঠাৎ এক সময় বাইরের বরান্দায় দুটি চড়ুই পাখির ব্যাকুল ডাক শুনতে পেলাম। আমি ছাড়া এই ডাক আর কেউ শুনতে পায় না। বাড়ির অন্যান্যরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত, চড়ুই পাখির ডাক শোনার সময় নেই কারুর।

আমি কান খাড়া করে রইলাম। যদিও চোখটা খবরের কাগজের দিকে, কিন্তু মনোযোগ বাইরে।

চড়ুই পাখি দুটো অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে, তার মাঝখান থেকে ভেসে এলো একটা কাকের গম্ভীর মোটা গলার ডাক, ক-অ-অ, ক-অ-অ।

এবার বুঝতে পারলাম। উঠে এলাম বাইরে। চড়ুই পাখি দুটো ওপরের দিকে মুখ তুলে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগলো। আমি বারান্দার ওপরের দিকে দেখলাম। ঘুলঘুলির কাছে একটা কাক এসে বসেছে, ভেতরে ঠোঁট গলিয়ে বিশ্রীভাবে ডাকছে।

ঘুলঘুলিটার মধ্যে চড়ুই পাখির বাসা, কাকটা এসেছে বাচ্চা চুরি করতে। হাত উঁচু করে হুস হুস শব্দ করলাম। কাকটা রক্তচক্ষে আমার দিকে তাকালো। ঠিক জল-দস্যুর মতন তার চেহারা।

আমি দু'চারবার কাকটার দিকে কাল্পনিক ইট ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করতে কাকটা নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়ে গিয়ে খুব কাছেই একটা বিজলি-দণ্ডের ওপর বসলো, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। চড়ুই পাখি দুটো তাদের বাসায় উঠে গিয়ে অন্যরকম স্বরে ডাকতে লাগলো।

আমি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। খাবার ও খবরের কাগজে যেই একটু মনঃসংযোগ করেছি, আবার বাইরে থেকে ভেসে এলো চড়ুই পাখির বিপন্ন ডাক। ফের উঠে এলাম বাইরে। কাকটা আবার ঘুলঘুলির কাছে এসে বসেছে, ঠোঁট দিয়ে ভেতরে খোঁচাচ্ছ।

যতই রাগ হোক কাককে মারা যায় না। কাক মারা যে কত বিপজ্জনক তা সবাই জানে। সুতরাং ঘর থেকে একটা পাঁউরুটির টুকরো এনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলাম রাস্তায়। কাকটা এবার সেই দিকে উড়ে গেল। চড়ুই পাখি দুটো ডাকতে লাগলো টি-টি-টি-টি, টি-টি-টি-ট্রি.....

আমি মোটমাট তিনটে পাখির ভাষা জানি। চড়ুই, কাক আর শালিক। প্রায় প্রত্যেকদিন সকালেই আমার কিছুটা সময় এদের নিয়ে কাটে।

মানুষের সঙ্গে কয়েকটা পশুপাখি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। পশুর মধ্যে যেমন বেড়াল আর কুকুর। বইতে পড়েছি, প্রাগৈতিহাসিক আমলে মানুষ যখন জঙ্গলের বড় বড় হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ঘাসবনে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই সময় থেকেই কুকুর তার সঙ্গী হয়। কুকুর আসলে নেকড়ে জাতীয় প্রাণী। মানুষ তার আগে পর্যন্ত অন্যান্য বাঁদরদের মতন ছিল নিরামিষাশী। ঘাসবনে এসে বাধ্য হয়ে তাকে আমিষ খেতে হয়, সেখানে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ সহজে মেরে খাওয়া যায় বলে। নেকড়েও ঘাসবনের প্রাণী, কিন্তু মানুষ এসে তার শিকারে ভাগ বসাবার পর সে বেচারারা কিছুদিন চুরি-ছ্যাঁচড়ামির চেষ্টা করলো, তারপর বুদ্ধিমানের মতন বশ্যতা স্বীকার করে নিল, তারা হয়ে গেল মানুষেরই শিকারের সঙ্গী। নিজেরা খাওয়ার পর মানুষ যে এঁটো-কাঁটা-হাড় ছুঁড়ে ফেলে দেয় তা খেয়েই ওরা সন্তুষ্ট।

মানুষ যখন সভ্য হলো, শিকারের অভ্যেস কমে গেল, তখনও এই নেকড়ে জাতীয় প্রাণীটি মানুষের সঙ্গ ছাড়লো না। বাৎসল্য, অপুত্রকের নিঃসঙ্গতা আর অপরের প্রতি হুকুম করার লোভ— মানুষের এই তিনটি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কুকুর নিরাপদ স্থান পেয়ে গেল মানুষের বাড়ির আশেপাশে। বিরাট আকারের কুকুরের গলায় শেকল বেঁধে যারা সকালবেলা বেড়াতে যায়, মনস্তাত্ত্বিকদের মতে তারা আসলে অপরের ওপর প্রভুত্ব করার শখটা সেই সুযোগ মিটিয়ে নেয়।

এত হাজার হাজার বছরের সংসর্গেও মানুষ কিন্তু কুকুরের ভাষা শিখতে পারে নি। বরং কুকুরই অনেকটা মানুষের ভাষা শিখে নিয়েছে। বিশেষত ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যাপারে তাদের বেশ একটা ঝোঁক আছে। সাহেবের চাকরের মতন কুকুর হুকুম শুনলেই মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, পায়ে এসে মুখ ঘষে এবং রাত জেগে ঘেউ ঘেউ করে।

বেড়াল কি করে মানুষের কাছাকাছি এসেছে, আমি জানি না। বেড়ালও মানুষের বাৎসল্যের সুযোগ নেয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি বেড়ালের প্রতি মেয়েদেরই দুর্বলতা বেশী, পুরুষদের খুব ক্বচিৎ। পুরুষের দুর্বলতা না থাকার কারণ বোধ হয় এই, বেড়াল নরম ও দুর্বল প্রাণী, তার ওপর হুকুম ফলিয়ে ঠিক সাধ মেটে না।

ইঁদুর আর ছুঁচোও মানুষের কাছাকাছি থাকে বটে, কিন্তু মানুষ এদের পছন্দ করে নি কোনোদিন। তবু যে এত হাজার হাজার বছর ধরে এরা টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য। ভারতের সব ইঁদুর মেরে ফেলতে পারলে নাকি আমাদের শস্য ঘাটতির অনেকখানিই সুরাহা হয়। সাঁওতালদের মুখে শুনেছি ইঁদুরের মাংস অতি সুখাদ্য, আমি অবিশ্বাস করি নি।যদিও সভ্য সমাজে আজও ইঁদুরের মাংস চালু হলো না! সাহেবদের একবার কোনোক্রমে ধরিয়ে দিতে পারলে হয়! আমি ইঁদুরের মাংস এখনো চেখে দেখি নি,কিন্তু ব্যাঙ খেয়েছি। সাহেবদের মধ্যে এখন ব্যাঙ খাওয়ার হুজুগ বেড়েছে বলে আমাদের গ্রাম দেশ থেকে ব্যাঙ প্রায় উজাড় হতে বসেছে।

আর একটি যে প্রাণী মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই শয়ন ঘরে যার স্থান, সেই টিকটিকির সঙ্গে মানুষের আজও কোনো বোঝাপড়া হলো না! মানুষ তাদের থাকতে দিয়েছে বটে, কিন্তু কোনো টিকটিকি মানুষের পোষ মানে না!

পাখিদের মধ্যে কাক-শালিক-চড়ুই ছাড়াও আরও কয়েকটি পাখি থাকে আশেপাশে। যেমন পায়রা। পায়রা একটু উদাসীন জাতের পাখি, কারুর সাতে পাঁচে থাকে না। পায়রার চোখের দৃষ্টি সব সময় বিস্ময়পূর্ণ। সেইজন্যই বোধ হয় এই পাখিটা এত সুন্দর। গোলা পায়রাগুলো বাসা বাঁধে মানুষের বাড়িতে, কিন্তু আর কোনো ব্যাপারেই মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের ওপর তাদের এই বিশ্বাস কোথা থেকে এলো। কে জানে! ভাগ্যিস, মুর্গীর মতন পায়রার মাংস খাওয়ারও চল হয়নি। যদিও পায়রার মাংস মোটেই অখাদ্য নয়, কাকের মতন।

কলকাতার মতন শহরেও আরও কয়েকট পাখি থাকে আমাদের কাছাকাছি। আমাদের বাড়ির সামনের শুকনো খটখটে মাঠে রোজই কয়েকটা সাদা রঙের বক এসে বসে। যদিও ওদের জলের ধরেই থাকার কথা। ডালহাউসি স্কোয়ারে বা ময়দানে দেখেছি ঝাঁকঝাঁক টিয়া পাখি। আকাশের দিকে

যে-কোনো সময় তাকালেই দেখতে পাই চিল। কখনো কখনো তারা ছাদের আলসেতে এসেও বসে। পশু জগতে যেমন ঘোড়া তেমনি পাখি জগতে চিলের মতন এমন নিখুঁত স্বাস্থ্যবান শরীর আর কারুর নেই। চিলের থেকেও বড় পাখি শকুন, কিন্তু কী রকম যেন হ্যালবেলে চেহারা, দেখলে ঘেন্না করে। শকুন আর হাড়গিলে একই পাখি কিনা আমি জানি না, কলকাতা পুরসভায় প্রতীক চিহ্নে আছে হাড়গিলে।।শহর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে ওদের দানের স্বীকৃতি।

চিল বোধহয় আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। আগে রাস্তায় ঘাটে ছোট ছেলেদের হাতে খাবারের ঠোঙা দেখলেই চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত, এখন আর সেরকম ঘটে না। যেমন আগে সন্ধ্যেবেলা দেখতাম, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বাদুড়, কিংবা বেথুন কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাছগুলি বাদুড়ে ভরা থাকতো, এখন আর সে রকম দেখি না।

মশাও কি পাখি! তাহলে এর মতন হিংস্র পাখি আর নেই। প্রতিদিন ধারালো সিরিঞ্জ নিয়ে কোটি—অর্বুদ সংখ্যক মশা ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষের ওপর।। পৃথিবী থেকে বাঘ-সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও মশার সংখ্যা আরও বাড়ছে। মানুষ এর কাছে অসহায়।

পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই, কিন্তু চড়ুই, শালিক আর কাকদের নিয়ে আমি খানিকটা জড়িয়ে গেছি। আমাদের বাড়ির ঘুলঘুলিতে চড়ুই এর বাসা। কাক আর শালিকদের সব সময় ফন্দি সেই বাসা থেকে বাচ্চা বার করার। এর মধ্যে শালিকের হিংস্রতাই সবচেয়ে বেশী।

কাকের দোষ এই, তাকে দেখতে খারাপ। তার চোখে সব সময় একটা ধূর্ত ভাব। কিন্তু কাক আসলো বোকা। কাক যখন চড়ুই-এর বাসা থেকে বাচ্চা চুরি করতে আসে, তখন সে চুপ করে থাকতে পারে না। বিশ্রী মোটা গলায় ক-অ-অ, ক-অ-অ করে ডাকে। সেই ডাক শুনলেই আমি বুঝতে পারি। যেখানেই থাকি, উঠে এসে কাকটাকে তাড়িয়ে দিই।

কিন্তু শালিক আসে নিঃশব্দে। শালিকও দেখতে সুন্দর, তার চোখ দুটি যেন কাজল টানা, কিন্তু মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ভরা।

একদিন বারান্দায় এসে দেখি নীচে একটা চড়ুই-এর ডিম ভেঙে পড়ে আছে। দুটো চড়ুই আকুলভাবে ডাকছে। কাছাকাছি কোনো কাক নেই। পাশের এক নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে রাস্তায় এনে এঁটো-কাঁটা ফেলেছে, সেখানে যত রাজ্যের কাকের ভিড়। কাক সর্বভুক বলেই পাখির ছানার উপর বিশেষ কোনো লোভ নেই। কিন্তু শালিক বোধ হয় পুরোপুরি মাংসাশী।

পাশের বাড়ির বারান্দায় দুটো শালিক গর্বের সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডাকছে পিড়িরিং, পিড়িরিং! এ ডাকটা একটু অন্য রকম। কাককে ঢিল ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলে তবু একটু উড়ে যায়, শালিক দুটো আমাকে গ্রাহ্যও করলো না।

আমাদের বাথরুমে ট্যাঙ্কের ওপর শালিক পাখির বাসা। কাক এসে কখনো সেখানেও খোঁচাখুঁচি করে। কিন্তু শালিকের সঙ্গে কাকরা পারে না। তিন চারটে শালিক মিলে তেড়ে গেলেই কাক পালায়। কাক শুধু বোকা নয়, ভীতুও। কয়েকটা শালিক মিলে একটা কাককে বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি।

কিন্তু চড়ুই পাখিরা কাককে তাড়া করতে পারে না। তারা শুধু অসহায় ভাবে ডাকে। তাদের সেই ডাকটা আমি সহ্য করতে পারি না।

চড়ুই পাখির অনেকরকম ডাক আছে। আস্তে আস্তে সেগুলো আমি চিনে গেছি। খাবার টেবলে বা লেখার টেবলে বসে তাদের টি টি টি টি, টি টি টি ট্রি ডাকটা শুনলেই আমি উঠে বেরিয়ে আসি বাইরে। ঠিক দেখতে পাই কোনো কাক বা শালিক হামলা করছে তাদের বাসায়।

কাকগুলোকে ঠাণ্ডা করার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। চড়ুই-এর বাসায় হামলা করলেই তাদের আমি দু এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিই। তারা তাতেই খুশী। এখন সকালবেলা দু'তিনটে কাক প্রথমে বারান্দার রেলিং-এ বসে কা-ক-অ, কা-ক-অ করে ডাকতে শুরু করে। তখন বুঝতে পারি, তারা বলছে, তুমি আমাদের খাবার দেবে, না চড়ুই-এর বাচ্চা খাবো? তখন আমি তাদের প্রাপ্য খাবার

মিটিয়ে দিই। কিন্তু শালিককে ঠাণ্ডা করি কি উপায়ে? তারা রুটি ফুটি পছন্দ করে না।

পর পর দু'দিন দুটো ভাঙা চড়ুই-এর ডিম পড়ে থাকতে দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। আমি বাথরুমে একটা টুল নিয়ে গিয়ে শালিকের বাসার সামনে দাঁড়ালাম। ঝটপট দুটো বড় শালিক এসে বসলো জানলায়। প্রথমে ভাবলাম, শালিকের বাসা ভেঙে তছনছ করে ওদের ছানাগুলোকে ফেলো দেব রাস্তায়। শালিক দুটো টুচিটুং টুচিটুং করে ডাকছে। এখন আর কণ্ঠস্বরে গর্বের সুর নেই। কাজল টানা চোখে দারুণ ভয়!

আমি তাদের বাসার কাছে হাত নিয়ে গিয়েও থেমে গেলাম। তারপর বললাম, এই দ্যাখো, আমি ইচ্ছে করলেই তোমাদের বাসা ভেঙে ফেলতে পারি! দেখছো তো? কিন্তু ভাঙলুম না। ফের যদি চড়ুই পাখির বাসায় হামলা করো। তাহলে কিন্তু ঠিক...

বারান্দার রেলিং-এ তখনও চড়ুই পাখি দুটো বসা। আমি তাদের বললাম, যাও, আর ভয় নেই, আমি শালিকদের বলে দিয়েছি।

চড়ুই পাখি দুটো ডাকলো, চিড়িং চিং, চিড়িং চিং...

আমি ঐ ডাকের মানে জানি।

তিন

অমিয়া ঠাকুরকে কী সুন্দর দেখতে! টুকটুকে ফর্সা রং, মাথার চুল ধপধপে, সেই রঙেরই শাড়ি এবং একটি শাল গায়ে জড়ানো। ঠিক যেন অপ্সরী। বয়েস হলো বাহাত্তর তিয়াত্তর, কিন্তু সময় হেরে গেছে তাঁর কাছে। আমি অমিয়া ঠাকুরকে সামনাসামনি দেখি নি কখনো, একটা বিশাল হলঘরের একেবারের পিছনের সারি থেকে মঞ্চের ওপর তাঁকে দেখে মনে হলো, বহু দিন এমন সুন্দরী আমার চোখে পড়ে নি।

তিনি গাইছিলেন, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেন।' এর মধ্যে 'ব্যাকুল' শব্দটি বড় ব্যাকুল করে দেয়। মুচড়ে ওঠে বুক। মনে হয়, আমারও অনেক কিছু বলার ব্যাকুলতা আছে, কেউ শুধায় না, কেউ শুনতে চায় না। একটু বাদেই আবার সতর্ক হয়ে যাই। এটা তো মেয়েদের গান, এ ব্যাকুলতা তো মেয়েদের। এরকম দুঃখী দুঃখী মরমী আর্তনাদ তো আমাকে মানায় না। তবু কেন আমার নিজের কথা মনে হচ্ছে? গানের এই জাদু কিছুক্ষণ আমাকে বিমূঢ় করে রাখে।

তারপর মনে হয়, এটা তো অমিয়া ঠাকুরেরও মনের কথা হতে পারে না। এ গান লেখা হয়েছিল তাঁরও জন্মের প্রায় পনেরো বছর আগে। সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি যুবক, অত্যন্ত রূপবান কিন্নর কণ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠদের অতি স্নেহের এবং সমসাময়িক নারীদের অতি প্রিয় রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' নামের পালা লিখে দিয়েছিলেন সখি সমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনয়ের জন্য। পুরোটাই প্রেমের সুখ স্বপ্ন, তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে ইচ্ছে করে তৈরি করা দুঃখ ও বিরহ, যা এখনকার পৃথিবীর সঙ্গে একদম মেলে না। তবু আশী নব্বই বছর পেরিয়ে এসেও সেই গান এক বৃদ্ধার কণ্ঠ থেকে মর্মভেদ হয়ে ঝড়ে পড়ে এবং আমার বুকে ধাক্কা মারে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি। বিশাল হলটির প্রায় প্রত্যেকটি চেয়ারই ভর্তি। সকলেই নিঃশব্দ, উৎকর্ণ এবং ব্যগ্র।

সে কি মোর তরে পথ চাহে

সে কি বিরহ গীতি গাহে...

এই জায়গাটা শুনতে শুনতে মনে হয়, আর কারুর নয়, এটা অমিয়া ঠাকুরেরই নিজস্ব কথা, তিনি এক তন্বী কুমারী, একজনের বাঁশীর ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এইমাত্র, তবু মনের মধ্যে এই সন্দেহ, সে-ও কি আমার অপেক্ষায় রয়েছে, আমার দেখা না পেয়ে দুঃখে কেঁদেছে? দূরে ফুলমালা দিয়ে সাজানো মঞ্চ অলীক হয়ে যায়, অত্যন্ত বেশী ভালো লাগার মতন কষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথকে আর একবার কুর্নিশ জানাই। খুব ভালো করে বিচার করে দেখতে গেলে, এই গানটি, এই বিশেষ গানটির বাণী বন্ধন এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নয়, অল্প বয়সের কাঁচা হাতের ছাপ আছে, এবং মূল কথাটি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার করা। তবু এই সামান্য কথা এবং সুর মিশিয়ে সত্যিকারের একটা মায়ার খেলা তৈরি হয়ে গেছে, প্রমদা মূর্তিমতী হয়েছে মঞ্চের ঐ বৃদ্ধার মধ্যে, এবং কয়েক হাজার নারী-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয়েছে।

সিগারেট টানার জন্য বাইরে উঠে আসি। এক সাহেবের লেখায় পড়েছিলাম, সত্যিকারের ভালো শিল্প রস একটানা প্রশিক্ষণ উপভোগ করা যায় না। চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট পরে মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়। মিউজিয়ামগুলো যেমন ভালো ভালো শিল্প বস্তুতে ঠাসা, সব ঘুরে দেখতে তিন চার ঘন্টা লাগে, কিন্তু তার অনেক আগেই আমাদের পা ও মাথা ক্লান্ত হয়ে যায়। শেষের দিকের অনেক কিছু শুধু চোখ দিয়ে দেখা হয়, মন দিয়ে নয়। সেই জন্যই বোধ হয় সারা রাত্রিব্যাপী গানের জলসায় অনেকেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

চায়ের সঙ্গে সিগারেটের স্বাদ আজ অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ একটু আগে আমি একটা ভালো গান শুনেছি। শিল্পই তো জীবনকে বেশী উপভোগ্য করে তোলে। কাছাকাছি অন্যদের দিকে তাকিয়ে আমার আর একটি কথাও মনে হয়। এখানে যেন কলকাতার আর একটি রূপও দেখতে পাচ্ছি। দু'তিন হাজার লোক এখানে এসেছে একটাই টানে। রবীন্দ্রনাথের গানের এই চুম্বক-শক্তি এখনো আছে, কিংবা দিন দিন বাড়ছে। পৃথিবীর আর কোথাও, শুধু এরকম একজনের গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে শোনবার জন্য এত লোক ছুটে আসে কি? মনে তো হয় না? রবীন্দ্র সঙ্গীত এখন আর ফ্যাশানের পর্যায়ে নেই, রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতার তেমন স্নবভ্যালু এখন আর নেই। যতটা আছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সমাদরকারীর কিংবা বিদেশী পপ মিউজিক ভক্তের। এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের এই শ্রোতারা আগে থেকেই জেনে আসে যে এখানে স্থুলরুচি বা লঘুরুচির কিছুই পাবে না। তা হলে এখনো এত লোক আছে কলকাতায় যারা বিশুদ্ধ শিল্পের আনন্দ পেতে ভালোবাসে? কলকাতার জন্য আমার একটু একটু গর্ব হয়।

অনুষ্ঠানটি ছিল শুধু মহিলা শিল্পীদের। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের কোনো ব্যাপার স্যাপার ছিল বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নারীর উক্তি, অনেক গান পুরুষের উক্তি। এখানে, সৌভাগ্যবশত, নারী মুক্তি উপলক্ষে একসঙ্গে অনেক নারীর উক্তি মূলক গান শোনা গেল। বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর, গীতা ঘটক থেকে শুরু করে রাজেশ্বরী, সুচিত্রা, কণিকা পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমস্ত উজ্জ্বল নারীরা উপস্থিত। ইস, আমার যে-সমস্ত বন্ধু-বান্ধবরা কলকাতার বাইরে থেকে তাদে কী দুর্ভাগ্য।

দু'হাতে দুটি চায়ের ভাঁড় নিয়ে একটি সদ্য যুবক হেঁটে গেল আমার সামনে দিয়ে। এখন পাঁচ মিনিটের বিরতি, তাই অনেকেই বাইরে এসেছে। চা-টা এত গরম যে আমি আমার ভাঁড়টা খালি হাতে ধরতে পারছিলাম না, হাতে রুমাল পেতে নিয়েছি।আর এই যুবকটি দু'হাতে দুটো ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছে কী করে? আমি চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। অদূরে থামের আড়ালে দাঁড়ানো একটি মেয়ে, তার হাতে একটি ভাঁড় ন্যস্ত হলো। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উহু-হু করে আঁচল দিয়ে ধরলো ভাঁড়টা। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো তোমার গরম লাগছে না?

ছেলেটি স্মিত হাস্যে বললো, লাগছে!

—রুমাল দিয়ে ধরো না!

—রুমাল আনতে ভুলে গেছি!

মেয়েটি মৃদু ধমকের সঙ্গে বললে, কী অদ্ভুত! তারপর অন্য হাত দিয়ে নিজের কোমরে গোঁজা ছোট্ট একটা রুমাল বার করে দিয়ে বললো, এই নাও।

কিছুই না ব্যাপরটা! তবু এই সাধারণ দৃশ্যটি আমার চোখে গেঁথে থাকে। ঐ যে যুবক ঐ যে যুবতীর জন্য হাতে ছ্যাঁকা লাগিয়ে চা নিয়ে গেল, এই যে এখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে চেয়ে আছে, যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই।এই চেয়ে থাকা যেন সুন্দরের বিশুদ্ধ প্রতিমা। মনে

হয়, এদেরই জন্য কত বছর আগে লিখে গেছেন গান এক কবি, আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!

তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে এলাম। আমি অনেক দিন পরে একই আসরে কণিকা আর সুচিত্রার গান শুনলাম। চাত্র বয়েস থেকে আমরা এই দু'জনের কাছে হৃদয় সঁপে দিয়েছি, তারপর কত বছর কেটে গেল, কিনতু এই দু'জন এখনো চির-নবীনা। কী জানি ওদের বয়েস বেড়েছে কিনা, কী জানি ওঁদের সংসারে আছে কিনা দুঃখকষ্ট-ঝামেলা আমাদের [illegible] জানবার দরকার নেই, ওঁরা শিল্পী, আমরা শুধু ওদের কাছে দাবিই করবো। সুচিত্রা মিত্রের [illegible] চঞ্চলা গতি, তরতর করে এসে ঝপাস করে বসে পড়েন, মুখের চার পাশে ছড়িয়ে থেকে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, মাথাটা একটু নীচু করে গান শুরু করেন। সেই ধারালো ঝকঝকে গলা। বিরাট জনসভায়, মিছিলে, কাঠের বাক্স দিয়ে বানানো মঞ্চে৷ যেখানেই সুচিত্রা মিত্রকে তুলে দেওয়া হোক অকুণ্ঠ গলায় তিনি গান ধরবেন, প্রেরণার মতন ছড়িয়ে পড়ে সেই গান। এক সময় তিনি দেশাত্মবোধক কিংবা দ্রুতলয়ের গানই বেশী গাইতেন, এখন বেশী গান মার্গসুর ঘেঁষা রবীন্দ্র সঙ্গীত। সুচিত্রা যেন নিজেই নিজের ভাগ্য বিজয়িনী।

আর কণিকা, খুব নরম ধীর পায়ে আসেন, এখনো যেন লাজুকতা মাখানো মুখ, সামনের দিকে চোখ তুলে বেশী তাকান না। কণিকা যেন মুধু নারী নন। মূর্তিময়ী নারীত্ব শুধু কবিকল্পনাতেই যাকে দেখতে পাওয়ার কথা। গান শুরু করার সময়ই মনে হয় যেন ওঁরা চোখ বুজে যায়। তারপর হঠাৎ আগে সহস্রবার শোনা থাকলেও আবার বিস্মিত করে বেরিয়ে আসে তরল সোনার মতন এক কণ্ঠস্বর। ঐ স্বর যেন এ জগতের নয়। সমস্ত বিরহ সমস্ত দুঃখ দিয়ে গড়া। যে-সব দরজা কোনোদিন হাত দিয়ে খোলা যায় না, ঐ গান সেই দরজা খুলে দেয়।

আমাদের কী সৌভাগ্য যে একই সময়ে, একই যুগে আমরা সুচিত্রা আর কণিকার মতন দু'জন গায়িকা পেয়েছি। আজ সন্ধেবেলাটা অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বেঁচে থাকা সার্থক করে দিলেন।

তবে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে একটা জিনিস খারাপ লাগে। বরীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেও কি এটা চলতো? সামনে খাতা খুলে গান করা? আট দশ লাইনের এক একটা গান, তাও দেখে দেখে গাইতে হয়? আমি তো এমন অনেককে চিনি, যারা গায়ক নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গান তাদের মুখস্থ? আমি নিজেই তো শখানেক গান মুখস্থ বলে দিতে পারি! তাহলে গায়িকাদের স্মৃতিশক্তি এত খারাপ হয়? কয়েক জন মাত্র খাতা খোলেন না, বেশীর ভাগই খোলেন। এটা অন্যায় নয়? শুনতে শুনতে যখন আমাদের মনে হয়, এটা যেন ঠিক গায়িকারই মনের কথা, সেই মুহূর্তেই যদি তিনি খাতা বা বই থেকে পরের লাইনটা দেখে নেন, তাহলে কি রকম যেন রসভঙ্গ হয় না? অনেক গায়ক গায়িকাই গানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন, সেজন্য তাদের একটু তো খাটতে হবেই, অন্তত একশো দেড়শো গান নিশ্চয়ই মুখস্থ করতে হবে।

সবচেয়ে অবাক হলাম ঋতু গুহকে দেখে। আজকাল কী সাঙ্ঘাতিক ভালো গাইছেন তিনি, গলায় যেন মন্দিরের কারুকার্য। একই সঙ্গে এত জোরালো ও সুরেলা গলা ইদানীং কালে আর কার? গানের সময় মনে হয় তিনি তন্ময় হয়ে গেছেন, অথচ তাকেও খাতা দেখতে হয়! দিন ফুরালো হে সংসারীর মতন চার লাইনের গানে? এ কি আত্মবিশ্বাসের অভাব?

এই সব গায়িকাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পর, কোনো অনুষ্ঠানে যখন তাঁদের কেউ গান গাইতে যাবেন, গেটের কাছে গাড়ি থেকে নামবার সময়েই খোঁচা খোঁচা চুল, ঢ্যাঙা মুখ বসন্তের দাগ, মিশমিশে কালো একজন গুণ্ডা মতন লোক তাঁর হাত থেকে গানের খাতাটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। সেই লোকটি আমি।

চার

লোকটি একটি চাঁদার খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ডোনেশান স্যার, কাইণ্ড স্যার, মাদার কালী'জ পুজা আই এ সারভেন্ট স্যার...

আমি হাত জোড় করে বললাম, মাপ করুন!

লোকটি আমার বাংলা কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল। সাধারণত এই ডাকবাংলোয় হোমরা-চোমরা অফিসাররাই আসে এবং তারা বেশীর ভাগই অবাঙালী। চৌকিদারের কাছে কাল রাত্রেই শুনেছিলাম, আমার মতো উটকো ভ্রমণকারী গত দু'বছরের মধ্যে আর একজনও আসেনি।

ধুতির উপর সাদা শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বগলে ছাতা, লোকটির বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি মনে হয়।

প্রত্যেকদিন সকালে কাগজ পড়ার একটা বিশ্রী নেশা হয়ে গেছে আমার। এখানকার লোক খবরের কাগজের ধার ধারে না। বাইরের জগতের সঙ্গে যা-কিছু যোগাযোগ রেডিও মারফত সপ্তাহে দুদিন স্টিমার আসে। সকালবেলা খবরের কাগজের অভাবে পরপর দু'কাপ চা খেয়েও ঠিক জমেনি, তাই আমি মধ্যপ্রাচ্যের খুনোখুনির বিষয়ে এক ইংরেজি নভেল নিয়ে বসেছিলাম, তার মধ্যে এই চাঁদার উপদ্রব ঠিক পছন্দ হয় না।

আমার বাংলা কথা শুনে লোকটি একটু বেশী সাহসী হয়ে আমার চেয়ারের আরও কাছে এগিয়ে এলো, খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে দুম করে বললো, স্যার বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে? মা কালীর পুজো যদি বাঙালীও না করে...

এমন প্রাদেশিকতা মোটেও প্রত্যাশা করিনি। তা ছাড়া মা কালী যে শুধু বাঙালীদের ওপরেই এতখানি নির্ভরশীল তাও জানা ছিল না।

গলার আওয়াজ এবার একটু কঠোর করেই বলতে হলো। মাপ করবেন, চাঁদাটাদা দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সকালবেলাতেই ভ্যাপসা গরম। দুপুর একটার আগে এখানে পাখা চলে না। লোকটি ধুতির খুঁটি দিয়ে মুখ মুছে বললো, পাহাড়ের ওপর উঠতে বড় কষ্ট, হাঁপ ধরে যায়! বয়েস হয়েছে তো! এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

কেউ জল চাইলে তাকে না বলা যায় না। ভিখিরিরা ভিক্ষে চেয়ে না পেতে পারে, কিন্তু কারুর বাড়িতে এসে এক গেলাস জল চাইলে কেউ ফেরায় না। এটা যদিও আমার বাড়ি নয়, ডাক বাংলা, তবুও আমার কাছেই তো জল চেয়েছে।

আমি অনায়াসে বলতে পারতাম, একতলায় জলের কল আছে। সেখান থেকে খেয়ে নি। কিন্তু একজন বয়স্ক লোকের মুখের ওপর এ রকম ভাবে বলা যায় না। চৌকিদারের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লাম।

টেবিলের উল্টো দিকে আর একটা চেয়ার আছে। জল আনতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে। এতক্ষণ কি লোকটি দাঁড়িয়ে থাকবে? যদিও চাঁদা আদায়কারীকে বসতে বলা বিপজ্জনক, তবু অনিচ্ছার সঙ্গে বলতেই হলো, বসুন। জল আনছে।!

টেবিলের ওপর পা তুলে আমি সকালবেলার আলস্য উপভোগ করছিলাম। একজন বুড়ো মানুষের মুখের সামনে পা তুলে রাখা যায় না বলে বিরক্ত গোপন করে পা নামাতেই হলো। কিন্তু বেশী কথা বাড়াবার সুযোগ না দেবার জন্য আমি বইতেই চোখ ডুবিয়ে রাখলাম।

কিন্তু লোকটি কথা বলবেই। ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনি কি ইলেকটিরি ডিপার্ট-এ এসেছেন?

—না!

—তবে কি সুপারভাইজ করতে এসেছেন?

—না।

—তবে?

—এমনি বেড়াতে এসেছি।

—বেড়াতে? এখানে তো শুধু বন-জঙ্গল, এখানে কী দেখবেন?

বিরক্তির বদলে এবার রাগ আসে। হুংকার দিয়ে উঠলাম, চৌকিদার! ইত্ না দেরি কাহে করতা?

চৌকিদার ততক্ষণে জলের জাগ আর গেলাস নিয়ে এসেছে। লোকটিকে আমি পুরো এক গেলাস জল শেষ করার সময় দিলাম। তারপর কটমট করে তাকিয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে। আর একবার চাঁদার কথা তুললেই ধমক দেবো।

লোকটি সেদিক দিয়েই গেল না! টেবিলের উপর পড়ে থাকা আমার সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে চেয়ে বললো, স্যার, আপনার একটা সিগারেট নিতে পারি?

এ তো মহা জ্বালা দেখছি! জলের সম্পর্কে যে নিয়ম আছে, সিগারেট সম্পর্কেও কি সেই নিয়ম খাটে? কেউ সিগারেট চাইলে তাকে দিতে আমি বাধ্য?

বয়স্ক লোক মাত্রই শ্রদ্ধেয় নয়। প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়ালেও অনেকের অভিজ্ঞতা কিংবা সভ্যতা ভদ্রতাবোধ বাড়ে না। তবু আমাদের অনেক দিনের সংস্কারে আছে, কোনো বয়স্ক লোককেই ঠিক তাচ্ছিল্য করতে পারি না।

বললাম, নিন। সিগারেট নিন। কিন্তু আপনাকে চাঁদা আমি দিতে পারবো না৷ আমি ঘুরে বেড়াতে এসেছি, আমার কাছে পয়সা কড়ি নেই।

—তা বললে কি চলে? এই ডাকবাংলা ছেড়ে যাবার সময় চৌকিদারকে তো অন্তত দুটো টাকা বখশিস দেবেন? আর মায়ের পূজোর জন্য দু'টাকা দিতে পারবেন না?

আমার মুখে প্রথমেই উত্তর এসেছিল, এই চৌকিদার আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে, তাই একে দু'টাকা বখশিস দেওয়া আমার দরকার। কিন্তু আপনার মাকে আমি বখশিস দিতে যাবো কোন্ দুঃখে?

এরকম নাস্তিকের মতন কথা লোকের মুখের পরে বলা যায় না। তাই ঘুরিয়ে বললাম, দেখুন, আপনাদের এখানকার পূজোতে স্থানীয় লোকেরা চাঁদা দেবে! আমি বাইরে থেকে দু'দিনের জন্য এসেছি, আমি কেন চাঁদা দিতে যাবো?

লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুক ফুক করে সিগারেট টানতে লাগলো। তারপর আবার বললো, স্যার, আপনি চাঁদা দেন বা নাই দেন, আপনার কাছে দুটো কথা বলবো? এখানে একটা কথা বলার লোক নেই। আমি বামুন, আশে পাশে দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে একটা বামুন খুঁজলে পাবেন না।

—আমিও তো শূদ্র!

—তা হোক! তবু আপনি লেখাপড়া জানেন, ভদ্রলোক। আপনি আমার দুঃখুটা অন্তত বুঝবেন।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এই সকালবেলা কে এখন এক বুড়োর লম্বা একঘেয়ে দুঃখের গল্প শুনতে চায়? সামনের জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায় অত্যন্ত ঘন সবুজ বন। বিশাল বিশাল পুরোনো সব গাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়। বেলা এগারোটায় এক ভদ্রলোকের জীপ গাড়িতে আমার এ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে যাওয়ার কথা।

আমি যথাসম্ভব নম্রভাবে বললাম, দেখুন, আপনার হয়তো অনেক দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু তার কোনো প্রতিকার করার সাধ্য তো আমার নেই! তাই আমি সেসব শুনে কি করবো?

লোকটি এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। রীতিমত চোখের জল পড়তে লাগল টপটপ করে।

পুরুষ মানুষের চোখের জল দেখলে আমার মনে দয়া-মায়া করুণা কিছুই জাগে না। আমি শুধু বিব্রত বা অস্বস্তি বোধ করি। সকালবেলা এই বিড়ম্বনা কি আমার প্রাপ্য ছিল কে লোকটিকে আসতে বলেছিল এখানে? আমি লোকটির কান্না থামার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতেই বললো, স্যার আপনি চাঁদা দেন না দেন, তবু আমার মন্দিরে একবার

অন্তত চলুন! দিনের পর দিন আমি সেখানে একলা থাকি, একলা পূজো করি। আর কেউ সেখানে পূজো দিতে আসে না। কেউ আসে না। রোজ পূজো দিতে গেলে সামান্য কটা বাতাসা, কিছু ধুপধুনোও তো লাগে?...তারও তো একটা খরচ আছে... সে কথা কেউ ভাবে না! যত দায় আমার....কিন্তু মায়েরা পূজো তো বন্ধ থাকতে পারে না?

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয়, লোকটি কোনো বারোয়ারি পূজোর জন্য চাঁদা চাইতে আসেনি। চাঁদা বলতে আমাদের সেই রকমই মনে হয়। সেরকম চাঁদা চাইতে আসে তিনি চারজন দল মিলে। এ লোকটি এসেছে কোনো মন্দিরের জন্য। মন্দিরের আবার চাঁদা কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মন্দির কোথায়?

লোকটি কান্না থামিয়ে বললো, এই পাহাড়ের ওপরেই, আর একটু ডানহাতি গেলে–পনেরো-কুড়ি মিনিটের পথ...এত উঁচুতে বলে কেই আসতে চায় না৷

ডাকবাংলাটাও পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে। গাড়ি ছাড়া এখানে আসা-যাওয়া বেশ কষ্টকর। কাল রাত্রে আমি নীচে নেমে হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম৷ফেরার সময় মনে হচ্ছিল পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাগ্যিস মাথার ওপরে মস্তবড় একটা চাঁদ ছিল, তাই সঙ্গী হিসেবে তাকে পেয়েছিলাম।

—তা এত উঁচুতে মন্দির বানালেন কেন?

—আমি তো বানাই নি? মন্দির বানিয়েছিলেন এক মাড়োয়ারীবাবু।

এবার আমি একটু শ্লেষের সঙ্গে বললাম, মাড়োয়ারীবাবু মন্দির বানিয়েছে তো সেটা চালাবার জন্য আপনাকে চাঁদা তুলে বেড়াতে হয় কেন? এ রকম কথা তো কক্ষনো শুনি নি!

লোকটি উত্তরে যা জানালো, তা থেকে একটা অন্য রকম ছবি ফুটে উঠলো। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এখানে কন্ট্রাকটারি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট মন্দির বানিয়ে দেন। বিহার উত্তর প্রদেশে যেমন প্রায় প্রত্যেক পাহাড়ের ওপরেই একটা করে মন্দির থাকে। বাঙালীদের মন্দির পাহাড়ের ওপর হয় না সাধারণত। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মেইন ল্যাণ্ডে ফিরে গেছেন৷এখন স্থানীয় বাঙালীরা মন্দির সম্পর্কে আগ্রহী নয়৷কষ্ট করে পাহাড়ের ওপর কেউ উঠতে চায় না। তা ছাড়া দেব-দ্বিজে ভক্তিও কমে যাচ্ছে বোধ হয়। এখন এই পূজারী বামুনটিকেই একা মন্দির চালাতে হয়৷একদিনও যাতে মায়ের পূজা বন্ধ না হয়, সেদিকে তার দারুণ সতর্কতা। এদিকে মন্দিরের এক পয়সাও আয় নেই। দেশে ফিরে গিয়েও ম্যাড়োয়ারী ভদ্রলোক প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করে পাঠাতেন, কিন্তু বছর দেড়েক আগে তিনি মারা যাবার পর ছেলেরা আর কেউ কিছু পাঠায় না।

আমি নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দির একবার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে আর বুঝি পূজো বন্ধ করা যায় না?

লোকটি জিব কেটে বললো, তা কখনো হয়? তা হলে যে মহাপাতকী হবো! আমি যতদিন বেঁচে আছি পূজো চালাবোই! আমার একটা পেট কিভাবে যে চলছে, তা কেউ চিন্তা করে না! তা না করুক! কিন্তু মায়ের পূজোরও তো কিছু খরচা আছে? তাও লোকেরা দেবে না! পৃথিবীটার হলো কি?

মন্দিরা থেকে নাকি ডাকবাংলাটা দেখা যায়। পূজারী বামুনটি যেদিনই দেখে রাত্রে ডাকবাংলার ঘরে আলো জ্বলছে সেদিনই বোঝে যে বাইরের কোনো অফিসার এসেছে। পরদিন সকালে সে তাই চাঁদার জন্য কাকুতি মিনতি করতে আসে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তো সবাই চাষবাস কিংবা চাকরি করতে এসেছে। আপনি পূজো করার জন্য এখানে এলেন কি করে?

সেও এক ইতিহাস। এখানকার সব বাঙালীর মতন, ইনিও পূর্ববঙ্গেরা চৌষট্টি সালে দেশত্যাগের পর পরিবারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ইনি ছিলেন দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পে আর এঁর জোয়ান ছেলে এসেছিল আন্দামানে চাষ করতে। কয়েক বছর পর লোকটি জানতে পারলো, এর ছেলে বাড়ি ঘর বানিয়ে সেখানে বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছে। তখন এ নিজেও অপশান দিয়ে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে এলো ছেলের কাছে।কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলো না। ডিগলিপুরে এর ছেলে এখন সত্যিই বেশ সম্পন্ন

চাষী। কিন্তু ছেলে বাড়িতেই শুয়োর আর মুর্গী পোষে। বাবা ধার্মিক মানুষ, সেই অনাচার সহ্য করবে কি করে? বামুনের বাড়িতে শুয়োর-মুর্গী! এক একটা মুর্গী আবার কক কক করে ঢুকে আসে শোওয়ার ঘরে। এমনকি পূজোর জায়গায় পর্যন্ত! তাই নিয়ে ছেলের সঙ্গে খিটিমিটি। ছেলে একদিন সাফ বলে দিয়েছে, থাকতে হয় তো এইভাবে থাকো, নয় তো নিজের পথ দেখো।

অভিমানী পিতা আবার গৃহত্যাগ করেছে। না খেয়ে মরবে তবু ঐ অনাচার চোখে দেখতে পারবে না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছাবার সময়েই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মন্দির প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই লোকটি তখন পেয়ে গেল নিজের মনের মতন কাজ! কিন্তু বছর দেড়েক ধরে আবার মহা বিপদ। মন্দিরের একটা পয়সা আয় নেই, লোকজনও কেউ যায় না।

কান্না থেমে গেছে, লোকটির গলা তবু এখনো ভাঙা ভাঙা। কথাগুলো হাহাকারের মতন শোনায়। তখনও বলে যেতে লাগলো, আমি মন্দিরের চত্বরে আলু আর টম্যাটোর চাষ করার চেষ্টা দিয়েছিলাম—কিন্তু শক্ত মাটি, বুড়ো বয়েসে গায়েও তেমন শক্তি নেই, কি করি এখন কন তো? এত নিষ্ঠা নিয়ে রোজ দু'বেলা পুজো করি, কেউ একবার দেখতে আসে না! একলা একলা পূজো করতে কি ভালো লাগে, বলুন?

আমি আর কি উত্তর দেবো?

ঠিক এগারোটার সময় জিপ এলো আমার জন্য। জঙ্গলে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গাড়িটা যখন পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামছে, তখন চোখে পড়লো মন্দিরটা। ঢং ঢং করে ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পূজারীটি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজো চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গের স্থানীয় ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা বুঝি কালী মন্দির!

তিনি বললেন, হুঁ। আমি যাই নি কখনো। শুনেছি একটা পাগলা বামুন একা একাই ওখানে পূজো টুজো করে!

ঢং ঢং শব্দটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে ভেসে আসতে লাগলো। মনে হলো যেন একটি নিঃসঙ্গ লোকের আর্তনাদ।

পাঁচ

বিলেত থেকে ফিরে এসে তপনদা একটা নাটকের দল খুললেন। পল্টুদাদের বাড়ির ঠাকুরদালানে রোজ সন্ধেবেলা রিহার্সাল।

তপনদা বিলেতে ছিলেন পাঁচ বছর। সেখানে যাবার আগে তাঁর নাটক সম্পর্কে কোনো উৎসাহের কথা কখনো টের পাই নি। আমাদেরও তিনি পাত্তা দেন নি কোনোদিন। একটু চালিয়াৎ ধরনের মানুষ, আমরা তাঁকে ফাঁটবাজ বলেই জানতুম।

বিলেত থেকে ফেরার পর তপনদার তিনটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। উনি বেশ ফর্সা হয়ে গেছেন। এমনকি মুখে একটা লাল আভা এসেছে। আগে মোটেই ফর্সা ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, উনি এখন আর চাল মারেন না, ইংরিজি বলেন না, খুব শান্ত নম্রভাবে, এমনকি আমাদেরও কাঁধে হাত দিয়ে আপন-আপন সুরে কথা বলেন। এবং এই নাটকের উৎসাহ।

কদিনেই আমরা তপনদার ভক্ত হয়ে উঠলুম। তখন আমরা বেশ ছোট, অবশ্য নিজেদের যথেষ্ট বড় ভাবি, সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করি।

নাটকটা তপনদা নিজেই লিখেছেন, নিজেই তার নায়ক এবং পরিচালক। নায়ক হবার মতন চেহারা তপনদার, বেশ লম্বা, মাথাভর্তি চুল, ফর্সা মুখটাতে দাড়ি কামাবার পর একটা নীলচে আভা পড়ে। তপনদা বিলেত থেকেই এক সময় একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি ঠিক করে এসেছিলেন, অফিস থেকে ফিরেই রিহার্সাল। পুরো নাটকটারই পটভূমিকা জঙ্গলের মধ্যে একটা বাংলোয়। তপনদা বললেন, জঙ্গল বোঝাবার জন্য স্টেজের ওপর শুধু একটি গাছ রাখা হবে। অরসন ওয়েলস নাকি

স্টেজের পেছনে শুধু একটা নীল রঙের পর্দা টাঙিয়ে তাতেই সমুদ্র বুঝিয়ে মবি ডিকের অভিনয় করেছেন।

আমরাও ছোটোখাটো পার্ট পেয়ে গেলাম। তপনদার আরও দু'একজন বন্ধু এলেন। তিনটি নারী চরিত্র, তাদের নিয়েই মুশকিল। পল্টুদার বোন স্নিগ্ধা ভালো গান গায়, কিন্তু সে অভিনয় করতে কিছুতেই রাজি নয়; আবার অরুণদের একতলার ভাড়াটে সবিতা পার্টি করতে খুবই রাজি, কিন্তু সে এত মোটা যে তাকে নায়িকার ভূমিকায় চিন্তাই করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক তিনজনকেই পাওয়া গেল, তবে অবশ্য দীপংকরদার স্ত্রী শান্তা বৌদিকে রাজি করবার জন্য তপনদাকে খুবই ঝুলোঝুলি করতে হয়েছিল।

শান্তা বৌদি আমাদের পাড়ার নামকরা সুন্দরী। দীপংকরদার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়ে প্রথম যখন শান্তা বৌদিকে দেখি, মনে হয়েছিল, এই মুখ আমি আগে বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নের নারীরাই শুধু এত সুন্দর হয়। শান্তা বৌদি সাধারণত চুলে খোঁপা বাঁধেন না, ওঁর চুল এত কোঁকড়ানো যে নিশ্চয়ই খোঁপা বাঁধার অসুবিধে। ওরকম কোঁকড়া চুলের জন্যই যেন ওঁকে ঠিক বাস্তবের নারী মনে হয় না। সে বছর আমাদের পাড়ার দুর্গা প্রতিমার মুখও হয়েছিল ঠিক শান্তা বৌদির মতন। দীপংকরদার সঙ্গে শান্তা বৌদিকে মানিয়েছিল খুব ভালো। দীপংকরদাও খুব দীর্ঘ শরীরের সুপুরুষ, তবে একটু গম্ভীর। দীপংকরদা প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক, পণ্ডিত হিসেবে খুব নাম।

শান্তা বৌদি খুব হাসিখুশী ছটফটে ধরনের। আমাদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে মিশতেন। শান্তা বৌদিকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যেত। সেটা ছিল মন খারাপ করারই বয়েস, যখন-তখন মন খারাপ হলে ছাদে যেতাম, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হতো, এই পৃথিবীতে আমি কত ক্ষুদ্র! আমার বেঁচে থাকা বা না থাকার জন্য কারোর কিছু যায় আসে না। সেই সময়েও শান্তা বৌদির মুখখানা হঠাৎ মনে পড়লে যেন একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ পেতাম। রূপেরও একটা সঞ্জীবনী ক্ষমতা আছে।

আমাদের রিহার্সাল বেশ জমে গেল। রাত্রি সাড়ে নটা দশটা হইহই করে চলে, পল্টুদা চায়ের ব্যাপারে খুব উদার, পাঁচ ছ'বার করে চা আসে সবার জন্য। কখনো বা তপনদার পয়সায় সিঙ্গাড়া ও সন্দেশ।

শান্তা বৌদি এমনিতে এত ছটফটে কিন্তু অভিনয়ের সময় দেখা গেল দারুন লাজুক। কিছুতেই পুরো একটা লাইন বলতে পারেন না। বারবার উনি হেসে ফেলে বলতে থাকেন, আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা এসব হবে না! আমার মনে হতো, শান্তা বৌদি এমনই সরল আর ভালো যে অভিনয় করা ওঁর পক্ষে সত্যি শক্ত। যে কখনো মিথ্যে কথা বলে না, সে কি অভিনয় করতে পারে? এর ফলে হলো কি আমাদের রিহার্সালের বেশীটা সময়ই খরচ হতো শান্তা বৌদিকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করতে।

বেশ কয়েক দিন পর আমি লক্ষ করলুম, তপনদা যখন আমার বা অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন, তখনও তিনি তাকিয়ে থাকেন শান্তা বৌদির দিকে। প্রায় সমস্ত সময়টাই তপনদার চোখ শান্তা বৌদিকে ছেড়ে বিশেষ নড়ে না! সতেরো দিনের মাথায় আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না যে তপনদা দারুন ভাবে শান্তা বৌদির প্রেমে পড়ে গেছেন।

ঘরের মেঝেতে মস্ত বড় কার্পেট পাতা, অরিন্দম তখন একা রিহার্সাল দিচ্ছে, আমরা বসে বসে দেখছি।তপনদা নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চান বলে বার বার নানা জায়গায় গিয়ে বসছেন। একবার গিয়ে বসলেন পেছনের দেয়াল ঘেঁষে শান্তা বৌদির পাশে, তারপর খুব সন্তর্পণে সবার অজান্তে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন শান্তা বৌদির দিকে, শান্তা বৌদির একটা অনিন্দ্য মাখনের মতন হাত কার্পেটের ওপর।তিনি সেই হাতটা সরিয়ে নিলেন না, তপনদাকে ধরতে দিলেন। অনেকক্ষণ পরস্পরের হাত ঐ রকম ধরাই রইলো।

তখন আমি উইপোকার চেয়েও বেশী অধ্যবসায়ী। রাশি রাশি বই পড়ে ফেলছি। প্রেম কাকে বলে তা আর জানতে বাকি নেই। তপনদার ঐ সব সময় শান্তা বৌদির দিকে গাঢ় ভাবে চেয়ে থাকা, সবার আড়ালে হাতে হাত ধরা এর মানে আমি জানি না?

আমার প্রথমেই মনে হলো, আর কেউ দেখেনি তো? এদিক ওদিক তাকালাম। অরিন্দম তখন এমন মজার ভঙ্গি করে চলেছে যে সবার চোখ তার দিকে, কেউ আর পেছনে ফিরে তপনদা আর শান্তা বৌদির হাত ধরে থাকা দেখতে পায় নি।

এরপর কয়েকদিন আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত ছটফটানি জেগে রইলো। আমি একটা গোপন জিনিস আবিষ্কার করেছি, কিন্তু কারুর কাছে বলতে পারবো না। এই সব ব্যাপার জানাজানি হলেই অমনি সবাই নানান রকম রসালো মন্তব্য শুরু করে দেয়। শান্তা বৌদির সম্পর্কে কেউ কোনো খারাপ কথা বললে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

আমি চোরা চোখে ওদের লক্ষ্য করি, এবং ক্রমশ আরো ভালো করে বুঝতে পারি, ওঁদের প্রেম আরও বেশী গাঢ় হচ্ছে। প্রেমটি তপনদারই বেশী। শান্তা বৌদি সেটা মেনে নিয়েছেন এবং কিছুটা প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন। এমন কি একদিন এটাও আবিষ্কার করলাম, শান্তা বৌদি অন্যদের আড়ালে তপনদাকে বলেন, তুমি,আর সবার সামনে আপনি। অভিনয় করতে পারেন না শান্তা বৌদি কিন্তু এই তুমি আপনিটা একবারও গুলিয়ে ফেলেন নি!

আমার ছটফটানি দিন দিন বেড়েই যায়। দীপংকরদা এমন নিপাট ভালোমানুষ, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না। শান্তা বৌদি কি দীপংকরদাকে ছেড়ে চলে যাবেন? তা হলে যে কী হবে, তা ভাবতেও পারি না।

তবে, এ কথাও বুঝতে পারি, ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কউ টের পায়নি এখনো। এই গোপনীয়তা বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে। তপনদা এবং শান্তা বৌদি দু'জনেই যথেষ্ট বড়, তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে কি করবেন সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার, অন্য কারুর মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবু আমি কিছুতেই মন থেকে এ চিন্তাটা তাড়াতে পারি না।

একদিন অনেক রাত্তিরে ছাদে একা বসে আছি। তখন বাড়ির মধ্যে ছাদই আমার একমাত্র জায়গা যেখানে নিরাপদে সিগারেট খেতে পারি এবং সেখনে বসেই আমার যত রকম চিন্তা ভাবনা ও সমস্যার সমাধান করতে হয়। শান্তা বৌদির কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ এক সময় আমার চোখে জল এসে গেল। আমি নিজেই অবাক। শান্তা বৌদির জন্য আমি কাঁদছি? শান্তা বৌদির তো বিপদ আপদ কিছু হয়নি, তিনি একটু প্রেম করছেন মাত্র।তাও তপনদা মোটেই মতলববাজ বা বদমাইস নন, শান্তা বৌদির কোনো ক্ষতি করবেন না নিশ্চয়ই। তবু কান্না কেন?

তখন আমি আর একটা আবিষ্কার করলাম। আসলে আমিও শান্তা বৌদিকে ভালোবাসি! যেটাকে আমি পূজা বলে ভেবেছিলাম, সেটা আসলে ভালোবাসাই। আমি শান্তা বৌদির হাত কোনো দিন চেপে ধরতে যাবো না। আড়ালে তাঁকে তুমি বলবো না, তবু আমি ভালোবাসি। এ অন্যরকম ভালোবাসা!

খুব ভোরবেলা আমি দুধ আনতে যেতাম। একদিন দেখি শান্তা বৌদি তিন-তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই সময়। এত ভোরে তো শান্তা বৌদিকে আর কখনো দেখি নি। উনি আমাকে দেখতে পান নি, তাকিয়ে আছেন রাস্তার অন্য পারে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা তপনদা হেঁটে যাচ্ছেন মন্থর পায়ে। রোজ ভোরে তপনদা দেশবন্ধু পার্কে সাঁতার কাটতে যান। শান্তা বৌদি তপনদাকে দেখার জন্যই এত ভোরে উঠেছেন। সন্ধেবেলা তো দেখা হয়ই, তবু সকালে দেখার জন্য এত ব্যস্ততা? বুকের মধ্যে একটা আকস্মিক দুঃখের ঝাপটা অনুভব করলাম।

আমাদের থিয়েটারের ঠিক আগের দিন আমরাই স্টেজ বাঁধলাম অনেক রাত পর্যন্ত। কোনো হল ইচ্ছে করেই ভাড়া করা হয়নি। পল্টুদাদের মস্ত বড় ঠাকুরদালান, সামনে বড় উঠোন, সেখানে আড়াই শো-তিনশো লোক ধরতে পারে। প্রথম কয়েকটি অভিনয় ওখানে হবে। তপনদা নিজেই স্টেজ বাঁধায় হাত লাগিয়েছেন।

মার্বেল পাথরের ঠাকুরদালান, তার ওপর মই লাগালে বার বার পিছলে যায়। তপনদা আমাকে ডেকে বললেন, এই মইটা শক্ত করে চেপে ধর তো। সাবধান ছাড়বি না কিন্তু।

আমি মইটা ধরলাম, তপনদা তরতর করে উঠে গেলেন ওপরে। এই সময় দূরে কোথায় যেন

শান্তা বৌদির গলা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছে হলো, মইটা ছেড়ে দিই! শ্বেতপাথরের ওপর তপনদা আচড়ে পড়ুক, মাথাটা চুরমার হয়ে যাক, ঘিলু ছিটকে চারদিকে...।

আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। এ আমি কী সব ভাবছি? আমি তপনদাকে মেরে ফেলতে চাই? আমার ভেতরে এতখানি ঈর্ষা জমে ছিল? অথচ বাইরে তো আমি তপনদাকে শ্রদ্ধাই করি! আমি তো কোনো দিন দীপংকরদাকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করি নি! কক্ষনো না! তা হলে?

শান্তা বৌদিকে আমি ভালোবাসি। প্রেমিকার সম্পর্কে কোনো রাগ থাকে না, কিন্তু প্রেমিকার অন্য প্রেমিকাতাকে সহ্য করা যায় না কিছুতেই। আমি মইটা ভালো করে চেপে ধরলাম যদিও, কিন্তু তপনদাকে ততক্ষণে আমি মনে মনে হত্যা করে ফেলছি!

ছয়

মাঝখানে আমার কিছুদিন শখ হয়েছিল সাঁতার কাটার। এমনিতে তো ব্যয়াম ট্যায়াম কিছু হয় না! বাড়ির কাছেই বালিগঞ্জ লেক, সেটারও সৎব্যবহার করা উচিত। একটা খাকি হাফ প্যান্ট কিনে ফেলাম। অনেক দিন পর হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে বেশ স্কুলের ছেলের মতন লাগে নিজেকে, যদিও আমার বুকে, হাতেপায়ে বড় বড় লোম।

কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ভোরবেলা উঠে লেকে যাই, পাবলিক পুলে, যেখানে চাঁদা টাঁদা কিছু লাগে না, সেখানে অনেক অচেনা নারী পুরুষের সঙ্গে জলের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতরাই। সাঁতার আর সাইকেল কেউ একবার শিখলে আর ভোলে না, এই নীতি অনুযায়ী আমি সাত-বছর অনভ্যাসের পা একদিন কায়দা করে লাফিয়ে সাইকেলে চাপতে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়েছিলাম সাইকেল-সমেত। কিন্তু সাঁতারটা সত্যিই ভুলি নি, একটু হাঁপিয়ে গেলেও ছোট লেকটা এপার ওপার করা যায়।

সাঁতার শিখেছিলাম ছেলেবেলায়, তখন হাফ প্যান্ট পরেই সাঁতার কাটতাম আমরা। কলকাতার গঙ্গায় কিংবা গ্রামের পুকুরে। সেই ধারণাটাই আমার রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালিগঞ্জের লেকে অন্য রকম কায়দা। সুইমিং ট্রাঙ্ক নামে এক প্রকার উন্নত ধরনের জাঙ্গিয়া পরে সবাই সাঁতার কাটে সেখানে। আমার মতন একজন ধেড়ে লোককে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় দেখে অনেকেই আড় চোখে তাকায়, কেউ কেউ ফিকফিকিয়ে হাসে। ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কয়েকদিন বাদে। কিন্তু তক্ষুনি একটা সুইমিং ট্রাঙ্ক কিনে ফেলতে দ্বিধা হয়। লোক মুখে শুনেছি, জিনিসটার দাম হাফ প্যান্টের তিন গুণ। আমার সাঁতারের ঝোঁক ক'দিন থাকবে কে জানে, শুধু শুধু একটা দামী জিনিস কিনে ফেলবো? তা ছাড়া হাফ প্যান্টেই কাজ চলে যাচ্ছে। নেহাৎ ফ্যাশনের খাতিরে...।

এই সময় একদিন সকালবেলা সাঁতার কেটে ফিরছি, দূরে দেখলাম ঝরনাদিকে। ছোট্ট ছেলেটির হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। প্রথমেই আমার মনে হলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। মাথার চুল আঁচড়ানো হয় নি, ভিজে হাফ প্যান্ট আর গায়ে তোয়ালে জড়ানো, এই অবস্থায় ঝরণাদির মতন সুন্দরীর সামনে দাঁড়ানো যায়?

ঝরনাদির ছেলে তার আগেই আঙুল তুলে বললো, মা, ঐ দ্যাখো, নীলুকাকা!

ধরা পড়ে গেলাম। আমি এগিয়ে এসে বেশ সহজ ভাবেই বললাম কি ঝরনাদি, বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি?

ঝরনাদি প্রথমে আমার গোদা গোদা ঠ্যাং সমন্বিত প্যান্ট পরা অপরূপ চেহারাটা দেখলেন। তারপর বললেন, তুই সাঁতার কাটিস বুঝি? ভালোই হলো। তুই একটু আসবি আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—টুবলুটাকে সাঁতার শেখাবার জন্যে ক্লাবে ভর্তি করে দেবো ভাবছি! তোর কোন্ ক্লাব?

—ক্লাব মানে? আমার তো কোনো ক্লাব নেই।

—তুই তা হলে কোথায় কাটিস? অমুক ক্লাবে যাস না?

লোকের বিভিন্ন পান্তে কয়েকটি সাঁতার ও দাঁড় টানার ক্লাব আছে। আধুনিকতম পোশাক পরিহিতা রমণী ও বিভিন্ন প্রকারের মোটর গাড়ি ও কুকুর দেখবার জন্য ছাত্র বয়সে আমরা ঐ সব ক্লাবগুলির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতাম।

আমি বললাম, ক্লাব ফ্লাবের দরকার নেই। আমার ওপর ভার দাও, টুবলুকে আমি চার পাঁচ দিনে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।

ঝরনাদি সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুই সাঁতার শেখাতে জানিস?

—এ আর শক্ত কি? সবাই পারে। তুমি সাঁতার জানো? তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি আমি।

—তোর লাইফ সেভারের সার্টিফিকেট আছে?

—সে আবার কি? সার্টিফিকেট মানে? তুমি দেখতে চাও? তোমাকে আর একবার সাঁতার কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি! আমি সাঁতার শিখেছি গ্রামের পুকুর। ঐ টুবলুর মতন বয়সে। ঐটুকু ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আবার সার্টিফিকেট লাগে নাকি?

—তুই জানিস না, ওরকম ভাবে শেখা আনসায়েন্টিকফিক। ছোট ছেলেদের শেখাতে হয় স্টেজ বা স্টেজাহাত আর পায়ের ওপর সমান জোর না পড়লে একটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ক্লাবে ট্রেইনড কোচ আছে।

—কিন্তু আমি যেখানে কাটি সেখানেও তো অনেক বাচ্চা ছেলে মেয়ে মা-বাবার কাছে শিখছে। আমি শিখেছিলাম আমার মায়ের কাছে, আমার তো কোনো অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায় নি?

তুই কোথায় কাটিস?

আমি আঙুল তুলে পাবলিক পুলটা দেখিয়ে বললাম, ঐ দ্যাখো না, এখানে তো কত লোক সাঁতার...

ঝরনাদি একেবারে আঁতকে উঠলেন। নাক কুঁচকে বললেন, উঃ অতলোক কার কী অসুখ আছে কে জানে, সবাই মিলে এক জায়গায়—ক্লাবে নিয়মিত জলে ওষুধ মেশায়...

আমি বুঝলাম, ঝরনাদির শুচিবাতিক আছে। যাদের এই অসুখটা থাকে, তারা কোনো যুক্তি মানে না।

বললাম ঠিক আছে, যাও তা হলে!

—তুই একটু আমার সঙ্গে চল না। কোতায় ফর্ম-টর্ম পাওয়া যায়, আমি জানি না। তোর সঙ্গে যখন দেখাই হলো—

আমি রাজি হয়ে টুবলুর হাত ধরলাম। টুবলু বেশ স্বাস্থ্যবান ছটফটে ছেলে, ভয় ডর নেই, চারদিকে টুকরো টুকরো ভিড়। লোকেরা ফিসফিস করো কথা বলছে। একজায়গায় একটি বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে একটা বড় ভিড়, মেয়েটি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

লোকের ফিসফিসানি থেকে বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে তার বাবা একজায়গায় বসিয়ে রেখে সাঁতার কাটতে গেছে। দু'ঘন্টা কেটে গেল, তবু ভদ্রলোক এখনো ফেরেন নি। লোকটি অবাঙালী, ক্লাবের অনেকেই তাঁকে চেনেন, তিনি একজন দক্ষ সাঁতারু। তবে তিনি কোথায় গেলেন, খুব সম্ভবত মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

ভিড় এড়িয়ে আমরা কাউন্টারের দিকে এগোলাম। কাউন্টারের ভেতরেও খুব উত্তেজনাময় আলোচনা চলছে। আমি তিন চারবার বললাম, ও দাদা, শুনছেন, ও দাদা !কেউ কানই দেয় না। এমন সময় আর একটি লোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে, প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, সবাই মিলে চ্যাচামেচি শুরু করলো, তারপর সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কাউন্টার ফাঁকা।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মাঠের সব লোক ছুটছে একদিকে। ঝপাঝপ করে কয়েক জনের জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনলাম।

আমি ঝরনাদিকে বললাম, তোমরা একটু দাঁড়াও দেখে আসি ওখানে কী হচ্ছে।

একটু উঁকি মেরেই ব্যাপরটা বোঝা গেল । অবাঙালী ভদ্রলোকটির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে, পাড়ের কাছেই, কাদার মধ্যে গেঁথে থাকা অবস্থায়। তিনি দক্ষ সাঁতারু ছিলেন কিন্তু ভালো ড্রাইভার ছিলেন না। সেদিন হঠকারীর মতন তিনতলা থেকে ড্রাইভ দিয়েছিলেন। মৃত্যুই নিশ্চয় হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়েছিল লোকটিকে। কাদার মধ্যে গেঁথে রয়েছেন দু'ঘন্টা ধরে, কেউ লক্ষ্যও করে নি। এতক্ষণ বাদে একজনের মনে পড়েছে যে লোকটিকে ডাইভিং বোর্ডের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

মৃত্যু যাকে তাকে যখন তখন নেয়। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার বাবাকে না নিয়ে গেলে চলতো না? অন্য কোনো সময় ঐ লোকটিকেই নেওয়া যেত না?

কাদা মাখা মৃতদেহটি ধরাধরি করে তুললো তিন চারজন। ঘাড়টি এমন ভাবে ঝুলছে যে মনে হয় শিড়দাঁড়া ভেঙে গেছে। বাচ্চা মেয়েটির কান্না যাতে আমাকে শুনতে না হয়, তাই আমি দু'হাতে কান চাপা দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে এলাম।

আমাকে দেখেই ঝরনাদি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। মুখখানা রক্তহীন, ফ্যাকসে। আমি যেই বললাম, সেই লোকটা...। ঝরনাদি অমনি বললেন, প্লীজ, প্লীজ, স্পিক ইন ইংলিশ। হি মাস্ট-নট নো এনিথিং...

ঝরনাদি বলতে চাইছেন টুবলু যেন কিছু জানতে না পারে। এসব ভয়ঙ্কর কথা টুবলুর মতন ছোট বেলার জানা উচিত নয়।

আজকাল মিশনারি স্কুলগুলির দৌলতে ছ'সাতবছরের ছেলেরাও দিব্যি ইংরেজি শিখে যায়। সুতরাং তাদের সামনে কোনো গোপন কথা কিংবা অসভ্য কথা ইংরেজিতেও বলে পার পাবার উপায় নেই।

সুতরাং আমি ঝরনাদিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গোপন সব ব্যাপারটা জানালুম। ঝরনাদি রীতিমতন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কাতর গলায় বললেন ইস, কী হবে!

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ঝরনাদির খুব কোমল মন, তিনি ঐ অচেনা লোকটির এরকম বেঘোরে মৃত্যুর জন্য খুব ব্যথা পেয়েছেন। কিংবা ঐ ছোট মেয়েটির কথা ভেবেই। একটু বাদেই আমার সে ভুল ভাঙলো। পৃথিবীর অধিকাংশ মায়েরাই নিজের সন্তানের সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পৃথিবীর আর সব কিছু ভুলে যায়। ঝরনাদি নিজের সন্তানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষ করছেন। তিনি এখন শুধু ভাবছেন, ঐটুকু শিশুর মনে এরকম ঘটনা কী রকম ছাপ ফেলবে। যদি মনের মধ্যে দৃশ্যটা গেঁথে যায়? যদি কোনো 'কমপ্লেক্স' তৈরি হয়? যদি জল সম্পর্কে সারা জীবনের মতন ভীতি জন্মে যায়।

ঝরনাদি বারবার বলতে লাগলেন, ইস, কেন যে আজই এখানে এলাম? কেন যে আজই এরকম একটা...

বললাম, চলো, তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঝরনাদির বাড়িও বেশী দূরে নয়। আমার ভিজে হাফপ্যান্ট প্রায় শুকিয়ে এসেছে, লজ্জাটাও কেটে গেছে এতক্ষণে।

ক্লাব থেকে বেরুবার সময় টুবলু জিজ্ঞেস করলো, মা, আমি সাঁতার কাটাবো না?

ঝরনাদি বললেন, না। এ বছর তোমার সাঁতার কাটা হবে না।

—কেন?

—ইয়ে, সব ফর্ম ফুরিয়ে গেছে, এ বছর ভর্তি করবে না!

—কেন?

—এবার বেশী ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে কিনা।

—কে বললো? ওরা তো কিছু বলে নি।

—এই তো তোমার নীলুকাকা খোঁজ নিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য ঝরনাদি অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যেতে লাগলেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে টুবলু আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিজেই ছুটে গেল আগে আগে।

ঝরনাদি বললেন, আয়, এক কাপ চা খেয়ে যাবি নাকি? দেখিস যেন আজকের এই ব্যাপারটা টুবলুর সামনে আবার দুম করে বলে ফেলিস না। বাড়িতে মা আছেন—

টুবলু সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে উঠছে, তিনতলার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ঠাকুমা। তিনি বললেন, এর মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে গেল টুবলু সোনা?

টুবলু মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে বললো, না আম্মি, আমি আজ সাঁতার কাটি নি! ওখানে একটা লোক না, জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপর কাদার মধ্যে ঢুকে গেছে ভচাৎ করে! একদম মরে গেছে। তার একটা না মেয়ে, খুব কাঁদছে—তাই আজ ওখানে কেউ সাঁতার দেবে না!

আমি আর ঝরনাদি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটদের আমরা যতটা ছোট মনে করি, তারা মোটেই ততটা ছোট না। টুবলু পুরো ঘটনাটা আমাদের মতনই জেনে গেছে।

এবং এর পরেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে নস্যাৎ করে টুবলু তক্ষুনি তার ফুটবলটা নিয়ে দুমদাম করে খেলতে লাগলো মহা আনন্দে, আপন মনে।

সাত

কৃষ্ণা বললো, আমি আত্মহত্যা করবো!

আমি কোনো কথা না বলে ওরমুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর মুখে ফুটে উঠেছে প্রবল রাগ আর অভিমান। চোখ দুটি বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কিন্তু যে-কোনো সময়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে পারে!

আমি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলাম। গতকাল সন্ধেবেলাতেও দেখা হয়েছিল কৃষ্ণার সঙ্গে। তখন ও চমৎকার হাসিখুশী মেজাজে ছিল। অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। সিঁড়িতে পা দিয়ে ও হেসে বলেছিল, কাল বিকেলে ঠিক এসো কিন্তু!

কাল সন্ধের পর থেকে আজ বিকেলের মধ্যে তো আমি কোনো রকম অন্যায় করি নি। তবু কৃষ্ণা এত রেগে গেল কেন?

কৃষ্ণা বললো, তুমি আর আমাদের বাড়িতে কক্ষনো এসোনা। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে আত্মহত্যা করতেই হবে!

আমি ভয়ে ভয়ে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—তুমি আর কক্ষনো আমার সঙ্গে মিশো না! আমি মরে যাবো! আমি ঠিক মরে যাবো!

ওর কথাবার্তা উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। যদি ও মরেই যায়, তা হলে আর ওর সঙ্গে মিশবো কি করে? তারপর আর ওদের বাড়িতে আসবোই বা কেন? তাছাড়া আমার সাহায্য ছাড়া কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেই বা কি করে? আমার সাহায্য ছাড়া তো ও কিছুই পারে না! ওর ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে বই বদলানো শুরু করে পেন সারানো পর্যন্ত সব কিছুতো আমাকেই করতে হয়।

মেয়েরা হঠাৎ রেগে গেলে তাদের সঙ্গে তখন কোনো যুক্তিপূর্ণ কথা বলে লাভ নেই। নীরবতাই তখন শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

কৃষ্ণা তপ্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আরও অনেক কথা বলে যেতে লাগলো মিনিট পনেরো বাদে আমি বুঝতে পারলাম, সেদিন সকালবেলা কৃষ্ণা একজন অচেনা লোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছে। না, চিঠিখানাতে আমার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই, আমার কোনো উল্লেখই নেই। আগাগোড়া অসম্ভব অশ্লীল কথাবার্তায় ভরা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে জন্য তুমি আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

—আমি নিশ্চয়ই খুব খারাপ! নইলে লোকে আমাকে এরকম খারাপ কথা লিখবে কেন?

—যাঃ এর কোনো মানে হয়? পৃথিবীতে কত বদমাস লোক আছে।

—না, তবু কেন আমাকে লিখবে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে!

কৃষ্ণার মনটা খুব সরল। ও শুধু এতদিন পৃথিবীর ভালো জিনিস দেখেছে। এরকম আকস্মিক খারাপের ধাক্কায় খুব আঘাত পেয়েছে।

—দেখি চিঠিটা!

—সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি!

চিঠিটা ছিঁড়ে কয়েক টুকরো করে ফেলেছে ঠিকই,কিন্তু একেবারে ফেলে দেয় নি। ওর টেবিলের নীচেই টুকরোগুলো পড়ে ছিল, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমি জুড়তে বসলাম। খুব একটা শক্ত হলো না।

চিঠিখানা যে এতই কুৎসিত, তা আমিও ভাবতে পারি নি। নিশ্চিত কোনো অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত মানুষ। কৃষ্ণার শরীর অবলম্বন করে যাবতীয় বিকৃত আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। একটাও প্রেমের কথা নেই এরকম চিঠি মানুষ কেন লেখে? ধরা যাক, ঐ লোকটির খুব পছন্দ হয়েছে কৃষ্ণাকে, কিন্তু এইরকম চিঠি লিখে তাকে রাগিয়ে দিয়ে লোকটির কী লাভ হবে? অবশ্য রাস্তায় ছেলেরা মেয়েদের উদ্দেশ্যে যে অশ্লীল কথা বলে, তাতেই বা তাদের কী লাভ?

আশ্চর্যের ব্যাপার চিঠিটাতে লোকটির নাম ও ঠিকানা আছে। সে একলা থাকে। তার ঘরে কৃষ্ণাকে ঐ সব অসভ্য কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি লোকটার কাছে যাবো!

কৃষ্ণা আমার হাত চেপে ধরে বললো, না, তুমি যাবে না!

—কেন?

—এসব লোক যা খুশি করতে পারে! যদি তোমাকে—

আমি আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ওর সামনে তুলে ধরে বললাম, এটা দেখেছো? খুনীদের বুড়ো আঙুল এরকম হয়। কিরোর বইতে ছবি আছে।

রাগে দুঃখে কৃষার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমার ইচ্ছে হলো লোকটাকে খুন করতে।

লোকটার নাম বাসু হালদার। ঠিকানা রিপন স্ট্রীটে। হতে পারে ছদ্মনাম এবং ঠিকানা। তবু একবার দেখে এলে দোষ কি? তাছাড়া, ছদ্মনাম এবং ভুল ঠিকানা সাধারণত একটু সুন্দর গোছের হয়। বাসু হালদার কিংবা রিপন স্ট্রীট, এ দুটোর মধ্যেই খানিকটা সত্যের গন্ধ আছে।

রিপন স্ট্রীট ঠিক কোথায়, তখন আমি চিনি না। রিপন কলেজের নাম বদলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হয়েছে জানি, তা হলে কি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্ট্রীটই রিপন স্ট্রীট? ঐখানাকার একজন লোক কৃষ্ণাকে চিনলো কি করে? ঠিকানাই বা জানবে কেমন করে? কৃষ্ণা চিঠির টুকরোগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। আমাকে ও কিছুতেই ওখানে যেতে দেবে না। কিন্তু লোকটার নাম আর ঠিকানা তো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

সেই দিনই সন্ধেবেলা, কৃষ্ণাকে খানিকটা শান্ত করে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দু'জন বাস কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করতেই রিপন স্ট্রীটের হদিস পাওয়া গেল।

আমাকে যেতে হলো একাই কোনো বন্ধু-বান্ধবকে এ-কথা বলা যায় না। তাছাড়া কৃষ্ণাকে আমি খুব গোপন করে রেখেছি। এতদিন আমার মনে হতো, মেঘের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাসাদে যেন কৃষ্ণা থাকে, সেখানে আমি ছাড়া কেউ যেতে পারে না। আমি ছাড়া আর কেউ কৃষ্ণার রূপ প্রত্যক্ষ করে নি। হঠাৎ এই কুৎসিত চিঠিটা কৃষ্ণাকে রুক্ষ বাস্তবের মধ্যে টেনে আনে; আমি কৃষ্ণার মুখ, গলা, দুটি হাত, কোমরের খাঁজ আর পায়ের পাতা ছাড়া কিছুই দেখি নি, আর লোকটা কৃষ্ণার নির্লোম উরুর কথা উল্লেখ করেছে। আমি ওর মাথার ঘিলু ছড়িয়ে দেবো রাস্তার ধুলোয়।

রিপন স্ট্রীট রাস্তাটা বেশ লম্বা। একদিকে সার্কুলার রোড, অন্যদিকে ওয়েলেসলি। সার্কুলার রোডে এসে চকিতে আমার একটা কথা মনে পড়লো। এন্টালির কাছে এক ডাক্তারের চেম্বারে গত সপ্তাহে কৃষ্ণা দিন তিনেক এসেছিল।ওর অ্যালার্জির চিকিৎসা করবার জন্য। একদিন আমিই পৌঁছে

দিয়েছি। ডাক্তারখানাটিতে বেশ ভিড়, কৃষ্ণাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল, সেই সময়েই ওকে কেউ দেখেছে! এক হাজার জনের মধ্যে বসে থাকলেও কৃষ্ণার দিকে সকলের চোখে পড়বে। ও সাঙ্ঘাতিক কিছু রূপসী নয়, কিন্তু ও আলাদা।

হয়তো লোকটা কৃষ্ণার পাশেই বসেছিল। গা ঘেঁষে। ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে যখন কৃষ্ণা ওর নাম ঠিকানা বলেছিল, সেই সময় লোকটা শুনে নিয়েছে। এই কথা চিন্তা করেই আমর আরও রাগ বেড়ে যায়।

ডাক্তারখানায় একবার উঁকি দিলাম। আজও খুব ভিড়। এর মধ্যে বাসু হালদারকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। আমি তো আর পুলিস নই যে ভেতরে ঢুকে সকলের নাম জিজ্ঞেস করতে পারবো।

ঠিকানা খুঁজতে রিপন স্ট্রীটে ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার মতন। এটা ঠিক যেন বাঙালীপাড়া নয়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, অবাঙালী মুসলমান, চীনেএই ধরনের লোকই বেশী দেখতে লাগলাম। যেন বিদেশের কোনো অচেনা রাস্তায় এসেছি। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। আমি এসেছি প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু আমি অসহায়। বাসু হালদার যদি গুণ্ডা হয়? যদি একসঙ্গে চার পাঁচজন লোক আমাকে ঘিরে ধরে তাহলে আমি কী করবো?

এখনো ফিরে যেতে পারি! সসঙ্কোচে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। কেউ কি বুঝে ফেলেছে যে আমি কাপুরুষ? আমার হাতের আঙুল হত্যাকারীর মতন, কিন্তু কোনো মানুষকেই খুন করার সাহস আমার নেই। কিরোর বইতে ভুল ছবি দিয়েছে। আমি যদি এখন ফিরে যাই, কেউ কিছুই বুঝবে না। কৃষ্ণা তো আমাকে আসতে বারণই করেছিল। তবে যদি আমি ফিরে গিয়ে বলি খুঁজে দেখে এসেছি ঐ ঠিকানায় কোনো বাড়ি নেইতাতে কৃষ্ণা খুশী হবে না? হয়তো সত্যিই ঐ নাম ঠিকানায় কেউ নেই—তবু এত দূর এসেও যাচাই না করেও ফিরে যাবো? আর কেউ জানবে না, তবু নিজের এই সামান্য মিথ্যেটুকু মেনে নিতে লজ্জা পেয়ে গেলাম।

বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে এগোলাম। খুব কাছাকাছি চলে আসছে। আমার শরীর কাঁপছে। যদি ঠিকানাটা খুঁজে পাই, যদি বাসু হালদারকে দেখি, তখন আমি কী করবো? ওকে মারব? শরীরটা যেন ঐ চিন্তাতেই অবশ হয়ে আসে। কোনোদিন কোনো লোককে মারার জন্য এতখানি রাস্তা তেড়ে যাই নি!

এবার আমিই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন ঠিকানাটা ভুল হয়। যেন ঐ নামে কেউ যেন না থাকে! অশ্লীল চিঠি যারা লেখে, তারা কেউ কক্ষনো সঠিক নাম ঠিকানা দেয় না। আমি শুধু মুধু সন্ধেবেলাটা নষ্ট করতে এলাম!

বাঁ দিকে একটা গলি, সেটাও রিপন স্ট্রীট। একপাশে একটা বস্তি। ঠিক এই রকম জায়গাতেই গুণ্ডাদের আড্ডা থাকে। আমার নিয়তি যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। ঐ গলির মধ্যে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে। আমি নিরস্ত্র অসহায়। তবু আমাকে যেতে হবে। আসলে আমি লাজুক, কোনোদিন তো আমার মারকুট্টে বলে নাম নেই। তবু কেন এলাম!

গলিটায় আবছা অন্ধকার। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পুরোনো আমলের তিনতলা বাড়ি। দেওয়ালের রং চটা, পলেস্তারা খসে পড়েছে। দরজার ওপর ছোট্ট একটা সাইন বোর্ড তাতে বোঝা গেল ওটা একটা মেস বাড়ি। এবং সেই নম্বর।

উত্তেজনায় আমি রীতিমতন কাপছি! বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি যে অত দূরে এসে বাড়িটা খুঁজে বার করতে পেরেছি সে জন্য আমার একটু আনন্দও হচ্ছে। কিন্তু এরপর আমি কী করবো? আমি বাসু হালদারকে দেখতে চাই না। সে একটা ঘৃণ্য জীব, তার কাছে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

দরজার কাছেই একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পাজামা আর গেঞ্জি পরা, বেশ লম্বা, মাঝারি ধরনের বয়েস। লোকটি আমাকে দেখে ফেলেছে:

—কাকে খুঁজছেন?

যদিও সাইন বোর্ডেই লেখা আছে, তবু আমি বোকার মতন প্রশ্ন করলাম, এটা কি একটা মেস বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে খুঁজছেন?

যদিও লোকটা বাংলায় কথা বলছে, তা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে বাঙালী কেউ থাকে?

—হ্যাঁ আছে কয়েকজন। কাকে খুঁজছেন আপনি?

—বাসু হালদার।

লোকটি কি উত্তর দিতে সামান্য একটু বেশী সময় নিলো? বেশী তীক্ষ্ণভাবে তাকালো আমার দিকে? আমার বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হচ্ছে। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ।

—না, ও নামে কেউ থাকে না!

—হালদার কেউ নেই?

—না।

—না, কেউ থাকে না। ভুল ঠিকানা।

লোকটি আর কোনো কথা না বলে হঠাৎ হন্ হন্ করে ভেতরে চলে গেল। আমিও আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। আর কোনো লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে হলো না। আমার হাত-পা হাল্কা হয়ে গেছে। এখন যে রকম ভাবে হোক, এই গলিটা খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া দরকার। আমি চিঠি সঙ্গে আনি নি। যদি বাসু হালদারের দেখাও পেতাম, কী বলতাম তাকে? সে যদি চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করতো। কিংবা অন্য কেউও তো বাসু হালদারের নাম করে চিঠিটা লিখতে পারে!

আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল ঐ লোকটাই বাসু হালদার। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? ওই নিশ্চয়ই ভেবেছিল কেউ না কেউ আসবে; যাতে মেসের মধ্যে জানাজানি না হয়।

গলির বাইরে এসে বড় নিশ্বাস ফেললাম। লোকটা যদি বাসু হালদার হয়ে থাকে, তবু চট করে অস্বীকার করলো কেন? নিশ্চয়ই আমাকে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েই লোকটা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম, ও তা জানে না। বেশীর ভাগ সময় আমিই অপরাধী হয়ে থাকি, অন্যরা আমাকে শাস্তি দেয় কিংবা অপমান করে যায়। এক সন্ধের জন্য আমি আমার ভূমিকা পাল্টাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা কি অত সোজা!

আট

এক সময় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি প্রায়ই বই-চুরির অভিযানে বেরুতাম। তা বলে আমাদের নিছক ছিঁচকে চোর ভাবা উচিত নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু।

জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই বা কিছু আগে থেকে আমাদের দেশের বনেদী পরিবার ভেঙে পরতে থাকে। অনেক বিরাট বিরাট বাড়ি খাঁ খাঁ করে। এক সময় জমিদাররা ছিল শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। উনবিংশ শতাব্দীতে এরকম একটা ঢেউ উঠেছিল, তার মধ্যে বেশ খানিকটা ছিল ফ্যাশন বা হুজুগ। অনেকেই সেই হুজুগের বশবর্তী হয়ে নানারকম শিল্পসামগ্রী এবং দুর্লভ বই সংগ্রহ করতো। এখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরলে দেখা যাবে সেইসব জমিদারবাড়ি বর্তমান বংশধররা অধিকাংশই (আবার বলছি, অধিকাংশ, কোনো ব্যতিক্রম আছে) মুর্খ বা নিছক বস্তুতান্ত্রিক, শিল্প-টিল্পর ধার ধারে না।বাড়ির কোনো ঘরে জমা রয়েছে হাজার হাজার অতি মূল্যবান বই।যার মধ্যে এমন বইও আছে, বহু দাম দিলেও এখন পাওয়া সম্ভব নয়।কিন্তু বহুকাল তালা খোলা হয় না সেই ঘরের, মেঝেতে তিন ইঞ্চি ধুলো। আমার বন্ধু দেবরাজ সেইসব বই ন্যায় বা অন্যায় উপায়ে সংগ্রহ করে এনে পৌঁছে দেয় প্রকৃত সমঝদারদের কাছে। আমি তার তল্পিবাহক মাত্র।

দেবরাজ অনেক কিছু খবর রাখে। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কোথায় কোথায় বড় বড় জমিদারবাড়ি

আছে, তার একটা ম্যাপও সে তৈরি করে ফেলেছে। এ ছাড়া তার অনুচররা খবর দিয়ে যায় কোন দুর্লভ বই কোন্ বাড়ির আলমারিতে বন্দী আছে।

সেবার মুর্শিদাবাদের যে গ্রামটায় আমরা গিয়েছেলাম, তার নামটা বদলে দেওয়া দরকার, ধরা যাক্ গ্রামটির নাম হেতমপুর। ট্রেন থেকে নেমে মাইল তিনেক সাইকেল রিকশা চেপে গেলে হঠাৎ মনে হয় যেন রূপকথার রাজপুরীর সামনে এসে পড়েছি। কী বিশাল এক প্রাসাদ, প্রথমেই থাকে থাকে উঠে গেছে অনেকগুলো সিঁড়ি, তারপর মস্তোবড় বারান্দা, তারপর সুগম্ভীর, সুউচ্চ হর্ম্য। শোনা যায় মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়িকে টেক্কা দেবার জন্য এক হিন্দুরাজা এরকম প্রাসাদ বানিয়েছিল।

বাড়িটি তিন মহলা। একটা মহল শুধু ঠাকুরদেবতার মন্দিরেই ভর্তি। ছোট ছোট অনেকগুলো ঘরে অনেক রকম দেবতার মূর্তি।বোঝা যায় সেই দেবতারা বহুকাল বুভুক্ষু আছে, কেউ আর তাদের পুজোটুজো দেয় না। বাড়ির মধ্যেই প্রশস্ত উঠোনে একটি বাগান ছিল, এখন তাকে বাগানের কঙ্কাল বলা উচিত। দোতলা-তিনতালার প্রত্যেকটি ঘরের জানলা বন্ধ অর্থাৎ কেউ থাকে না।

ভেতর দিকে একতলার একটি ঘরে নায়েব বসেন, তাঁকে নায়েব না বলে মুহুরী বা কেরানীই বলা উচিত, কারণ জমিদারিই নেই, তার আবার নায়েব কি? লোকটি এই বাড়িটির সঙ্গে মানানসই রকমের অতি বৃদ্ধ, মাথাভর্তি ধপধপে চুল, আর এতই রোগা যে মনে হয় হাওয়া খেয়েই ওর পেট ভরে। আমরা সেই ঘরে ঢুকলাম।

প্রত্যেকটা বাড়িতে চুরি করার আলাদা আলাদা কায়দা আছে। এই বাড়িতে প্রযোজ্য কৌশল দেবরাজ আমাকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল। সে জন্য ইতিহাস জানতে হয়।

মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল যখন জমজমাট, তখন অনেক রাজপুত, মাড়োয়ারী এবং পাঞ্জাবী এসে এখানে ভিড় জমিয়েছিল। সকলেই মধুর লোভে। কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ বাণিজ্যে। একথা তো আমরা সকলেই জানি যে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস বদলে দিয়েছিলেন, এই মুর্শিদাবাদে বসেই, যার নাম জগৎশেঠ। এদের অনেক বংশধর এখনো এ অঞ্চলে রয়ে গেছে, পরিষ্কার বাংলা বলে, তাদের পদবী হয় সিংহ, সিংহানিয়া বা হিম্মৎসিংকা।এই ধরনের। যাই হোক, নবাবী আমলের পড়ন্ত বেলায়। একজন রাজপুত্র এই এলাকায় খুব দুর্দান্ত হয়ে ওঠে, সে-ই এই হেতমপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তার নাম বিক্রম সিং (নামটা একটু বদলে দিতে হলো, কারণ এখনো আমাদের ধরা পড়ার ভয় আছে)।

বিক্রম সিং-এর বংশের কয়েক পুরুষ খুব দাপটে এখানে রাজত্ব (আসলে জমিদারি, কেননা তাদের রাজা খেতাবটি স্বরচিত) চালিয়েছেন। কিন্তু তাদের মনোকষ্টের একটা কারণ ছিল। "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" নামে বইতে নিখিলনাথ রায় লিখেছেন ঐ বিক্রম সিং (তার আসল নাম বইতে আছে) একটি ডাকাত ছিল, অরাজকতার সময় লুটপাট করে নিজের জমিদারি বানিয়েছে। নিজের পূর্ব পুরুষ সম্পর্কে এরকম কথা কারুর ভালো লাগে না। তখন হেতমপুরের রাজবাড়িতে বিক্রম সিং-এর বিরাট অয়েল পেইন্টিং ঝুলছে। শোনা যায় বিক্রম সিং-এর এক বংশধর নাকি নিখিলনাথ রায়কে তাঁর বই থেকে ঐ অংশটুকু বদলে দেবার জন্যে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। গরীব ইস্কুল মাস্টার নিখিলনাথ রায় নিরীহভাবে বলেছিলেন, আমার বই থেকে দশটা লাইন কাটলেই কি আর আমার ইতিহাস বদলাবে? ইতিহাসকে কখনো কাটা যায়?

ধরা যাক ঐ বংশধরটির নাম জেদী সিং। সে অন্য পথ ধরলো। টাকার বিনিময়ে এক সাহেবকে দিয়ে লেখালো রাজা বিক্রম সিং-এর জীবনী। সাহেবও রবিন হুডের গল্পটি দিব্যি ঢুকে দিল। সে লিখলো যে বিক্রম সিং ছিল যেমন বীর তেমনি দয়ালু, অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক জমিদারদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সে বিলিয়ে দিত গরীব দুঃখীদের মধ্যে। ইত্যাদি। জেদী সিং সেই বই ছাপালো এক রক্ষ কপি। বিনামূল্যে সে বই বিতরণ করা হতে লাগলো। কিন্তু একলক্ষ ইংরিজি বই নেবার মতন লোক সে আমলে মুর্শিদাবাদে খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। বহু বই জমে রইলো স্তূপ হয়ে। জেদী সিং উইল করে গেল, যখন যে-কেউ এসে বই চাইবে তার এস্টেট থেকে অবশ্যই তাকে সে-বই দিতে হবে!

এই ইতিহাস জেনেশুনে আমরা ঢুকলাম নায়েবের ঘরে। পাকা মাথার বৃদ্ধটি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে হলো, অনেকদিন এখানে বাইরের কোনো লোক আসে না।

দেবরাজ সবিনয়ে বললো, শুনেছি, এই রাজবাড়ির লাইব্রেরিটি খুব বিখ্যাত, আমরা সেটি দেখতে এসেছি।

নায়েব বললেন, লাইব্রেরি? সেখানে আপনারা কি দেখবেন?

—আজ্ঞে, লাইব্রেরিতে বই দেখবো, তা ছাড়া আর কি? আমার এই বন্ধুটি রিসার্চ করে।ওর কয়েকখানা বিশেষ বই একটু দেখা দরকার॥

আমি রিসার্চ স্কলারদের মতন ভারিক্কি গম্ভীর মুখ করে রাখলাম।

নায়েব হাত নেড়ে বললেন, হবে না!

দেবরাজ বিন্দুমাত্র নিরাশ না হয়ে কণ্ঠস্বরে আরও মধু ঢেলে বললো, হবে না? আমরা এতদূর থেকে এসেছি......আপনি যদি একটু দয়া করেন....

নায়েব এবার আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে ভাই, আমি কি করবো? এ কি আমার বাড়ি? এ বাড়ি এখন ভুতের বাড়ি! রাজারা শহরে থাকে।তারা সাত ভাই সব সময়ে নিজেদের মধ্যে মামলা-মকদ্দমা লড়ছে।বিষয় সম্পত্তি গেছে রিসিভারের হাতে। আমি নিজেই তিনমাসের মাইনে পাই নি!

—কিন্তু লাইব্রেরির চাবি তো আপনার কাছে আছে!

—লাইব্রেরি ঘর একটা আছে বটে, দশ-পনেরো বছর সে ঘর কেউ খোলে নি। রাজাদের হুকুম নিয়ে আসুন, তবে ঘর খুলবো!

টেবিলের উল্টোদিকে দুটো চেয়ার ছিল। নায়েব আমাদের বসতে বলেন নি। দেবরাজ চোখের ইশারা করে আমাকে বললো, বোস!

আমরা দু'জনে বসলাম। তারপর দেবরাজ বেশ শক্ত গলায় বললো, আমরা 'লাইফ অফ বিক্রম সিং' বইটা নিতে এসেছি। সে বই আপনি দিতে বাধ্য।

—কেন বাধ্য কেন?

—এই এস্টেটের সেই রকম নিয়ম করা আছে। ঐ বই কেউ চাইতে এলে খালি হাতে ফিরে যাবে না!

নায়েবের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। গোল গোল চোখে আমাদের দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এরকম একটা কথা অনেককাল আগে শুনেছি অবশ্য। কিন্তু গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে সে বই কেউ চাইতে আসে নি। আপনার একথা জানলেন কি করে? ঐ ডাকাতের জবিনী পড়ে আপনাদের কী লাভ হবে?

—আজ্ঞে, আমরা এইসব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করি কিনা॥

—ঐ একখানা বই নেবার জন্য আপনারা কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চলুন তা হলে!

ভদ্রলোক টেবিলের টানা থেকে একটা চাবির তোড়া বার করলেন, যাতে অন্তত পঞ্চাশ ষাটটি চাবি। একসঙ্গে অত চাবি দেখলেই ভয় লাগে, একটু যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

বার বাড়িতে দোতলার উপর টানা তিনটি ঘর জুড়ে লাইব্রেরি। দরজা খোলার পর সেই ঘরের দৃশ্য দেখলে কান্না পায়। সার সার বইয়ের র‍্যাক। অধিকাংশই কাৎ হয়ে আছে, ঘুণে ধরা, একেবারে ঝুরঝুরে। দুটো আলমারি উল্টে পড়ে আছে। ছিন্নভিন্ন অবস্থায় হাজার হাজার বই। মেঝেতে পুরুধুলো, ঘরের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত মাকড়সার জাল।

দেবরাজ সত্যি বই ভালোবাসে। সে ঝাঁঝলো গলায় বললো, আপনারা কি মানুষ? এইগুলোর এ অবস্থা করেছেন? মাঝে মাঝে ঘরটা একটু সাফ করতেও পারেন নি?

বৃদ্ধ একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, রাখুন মশাই! আমি নিজে তিনমাসের মাইনে পাই নি, তবু পড়ে

আছি! চাকর-বাকররা সব পালিয়েছে! এ ঘর সাফ করা কি আমার দায়?

মুখে রুমাল বেঁধে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম যে-কোনো জিনিসে হাত দিলেই ধুলো ওড়ে। অনেক বই পোকায় খেয়ে একেবারে কুচিকুচি করে দিয়েছে। এ বাড়িতে কোনো এক পুরুষের বইয়ের খুব যত্ন ছিল। বহু বই বাঁধানো হয়েছিল মরোক্কা চামড়ায়। সেই চামড়ার লোভেই এত পোকা। বড় বড় ম্যাপ রাখার জন্য গোল গোল টিনের খাপ করা ছিল, যত্নের অভাবে সেগুলো এখন মুড়মুড়ে, ভেতরে আরশোলার বাসা।

নায়েব বললেন, দেখুন, এই জঞ্জালের মধ্যে আপনাদের সেই বই খুঁজে বার করা যায় কিনা!

দেবরাজ আর আমি দু'দিকে খুঁজতে শুরু করলাম। অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর এক একখানা বই কিছু আস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ারের ফোলিও এডিশন, এরিক প্যাটরিজের আদি ডিকশিনারি, মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সংস্করণ।প্রতিটি অমূল্য বই।

এক জায়গায় একসঙ্গে অনেক বই গাদা করা। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সবই সেই লাইফ অফ বিক্রম সিং'। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, পেয়েছি!

দেবরাজ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চাপা গলায় বকুনি দিয়ে বললো, চুপ কর না, ইডিয়েট!

তখন দেখলাম দেবরাজ অন্য দিকে এক-একখানা বই তুলছে আর জামার তলায় পেটে গুঁজছে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ, এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। আমাকেও ইশারা করলো। তারপর দু'জনেই পা-জামা আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরে এসেছি, তাই বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

খানিকটা বাদে আমাদের দু'জনেরই পেট ফুলে ঢোল। আর জায়গা নেই। বিক্রম সিং-এর 'লাইফ' দু'জনে দু'খানা হাতে নিয়েছি বটে, কিন্তু আর দুটি বেশ বড়ো বাঁধানো বই সম্পর্কে দেবরাজের দারুণ লোভ। ও দুটো ও নেবেই।

ধুলোর ভয়ে নায়েব ভেতরে ঢোকেন নি। দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, হলো আপনাদের? পেলেন?

দেবরাজবললো, হ্যাঁ, পেয়েছি। আর এই দু'খানা বই আমাদের দেবেন।

নায়েব বলে উঠলেন, না, না, অন্য বই আমি দিতে পারবো না। এ তো আমার বাপের জিনিস নয়!

—কিন্তু দেখুন, এগুলো তো নষ্টই হচ্ছে। তবু যদি অন্যের কাজে লাগে!

—আমার তো কোনো হাত নেই। রিসিভার এসে যদি বইয়েরও হিসেব চায়।

—এই বইয়ের হিসেব করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দেখুন কত বই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।কত বইয়ের একটা পাতাও আস্ত নেই। এরকমভাবে বই নষ্ট করা পাপ! আর কিছুদিনের মধ্যে আর একটা বইও আস্ত থাকবে না! তার চে' আমাদের দিয়ে দেওয়া ভালো নয়?

—আমি কি দেওয়ার মালিক!

—আপনার আসল মালিকরা কোনোদিন

এ-বইয়ের হিসেব নিতে আসবে না! আমাদের এই বই দুটো অন্তত দিন, আমরা দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছি!

বই দুটি হান্টারের গেজেটিয়ারের দুটি খণ্ড, ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের। তখনকার দিনে এক খণ্ডের দাম ছিল চার টাকা।

ভদ্রলোক বই দুটি হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, এসব পুরনো বইয়ের দাম বেশী হয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্তত ডবল দাম তো হবেই।

দেবরাজ আমাকে নকল এক ধমক দিয়ে বলরো, তুই খুবজানিস! পোকায় কাটছে, তার আবার দাম। অত টাকা আমরা পাবো কোথায়?

আমি বললাম, অন্তত দেড়গুণ দাম দেওয়া উচিত। দুটো বই বারো টাকা।

নায়েব বলরেন, পনেরোটা টাকা অন্তত দিন!

পনেরো টাকায় আমরা যে বই কিনলাম, তার দাম এখন অন্তত পনেরো শো টাকা।

সেই পনেরো টাকা পেয়েই বৃদ্ধ নায়েব এত খুশী হলেন যে তিনি জোর করে আমাদের নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে, চা মিষ্টি খাওয়াবেনই। আমি খুব আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দেবরাজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। ওর কায়দাই আলাদা। ও এই বৃদ্ধের সঙ্গে বেশী করে ভাব জমাতে চায়।

রাজবাড়ির সামনের রাস্তার উল্টোদিকে বৃদ্ধের বাড়ি। বাড়ি মানে দুটি অন্ধকার কুঠুরি। ব্যাপারটা দেখে খুব আশ্চর্য লাগে। সামনের রাজবাড়িতে অন্তত তিরিশ চল্লিশটা ঘর খালি পড়ে আছে তালাবন্ধ অবস্থায়-আর এই বৃদ্ধকে থাকতে হয় এই এঁদো কুঠুরিতে-অথচ ঐ সব ঘরের চাবি ওর কাছে। আমার ইচ্ছে হয় বৃদ্ধের কাছ থেকে চাবির থোকা কেড়ে নিয়ে ঐ প্রাসাদের প্রত্যেকটি ঘরের দরজা খুলে দিতে; আর কিছু নয়। অন্তত আলো বাতাস ঢুকুক!

বৃদ্ধের স্ত্রী নেই। বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে, থাকে বহরমপুরে। একটি যুবতী, একটি কিশোরী ও একটি বাচ্চা ছেলে আছে বাড়িতে, ওরা বৃদ্ধের নাতি নাতনী। বৃদ্ধের বড় মেয়েটিও গত হয়েছে এক বছর আগে। বড় মেয়েটিই চা এনে দিল।

যদিও আমাদের বেশ খিদে পেয়েছে, কিন্তু পেট ভর্তি। পেট ভর্তি বই নিয়ে বসাও বেশ কষ্টকর। বৃদ্ধ আমাদের বারবার একটি চৌকির ওপর বসতে বলছেন। সেখানে অতিকষ্টে বসেই দেবরাজ ওর পাঞ্জাবি তুলে বইগুলো বার করতে রত্নগলো। স্তম্ভিত বৃদ্ধকে একটাও কথা না বলতে দিয়ে ও পকেট থেকে একশোটি টাকা বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে, আমরা আবার আসবো!

পরের বার আমরা গিয়েছিলাম বড় বড় টিনের খালি ট্রাঙ্ক নিয়ে। যাতে আর পেটে বই গুঁজতে না হয়। প্রথমবার চুরি করতে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার ডাকাতি। প্রাক্তন ডাকাতের বাড়িতে ডাকাতি করায় দোষ আছে নাকি!

নয়

অনেকক্ষণ থেকেই ভদ্রলোক তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। ট্রামে যেদিকে দুটো লম্বা সীট থাকে সামনা-সামনি, সেখানে তিনি আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন। একজন অচেনা লোক বার বার মুখের দিকে তাকালে বেশ অস্বস্তি হয়। অথচ আমি একথাও বলতে পারি না যে, আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? মেয়েরাও একথাবলতে পারে না।

লোকটি সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মধ্যবয়স্ক, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই, দু'কানে বেশ বড় বড় চুল। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখলাম, লোকটিকে আমি চিনি না, কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ে না।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এসে, ট্রাম যখন বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে, ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একটা কথা বলবো? আপনার কি কন্যা রাশি?

আমার মুখে একটুও অবাক ভাব ফুটলো না। ভদ্রলোকের চোখের দিকে চোখ রেখে বললাম, জানি না তো?

—আপনি আপনার কোন্ রাশি জানেন না?

—না।

—আপনার নিশ্চয় ভাদ্র মাসে জন্ম?

—ভাদ্র মাসে যাদের জন্ম হয়, তারা বুঝি নিজেদের রাশি জানে না?

—সে কথা বলছি না। আপনার ভাদ্র মাসে জন্ম কি?

বুঝলাম, ইনি একজন শখের জ্যোতিষী। পেশাদার নন, কারণ নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে

পয়সা-কড়ির আশা করছেন না। আমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে আমার পকেটে পয়সাকড়ি থাকে না।

বললাম, হ্যাঁ, ভাদ্র মাসেই।

—আপনার বাবা বেঁচে নেই।

—নেই।

—আপনার পেটে মাঝে মাঝে খুব ব্যথা হয়? পেটের একটা অসুখ আছে।

—না তো। মিললো না এটা।

—সতেরো বছর বয়েসে আপনার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। জলে ডোবা, হ্যাঁ জলে ডোবাই, খুব বড় ফাঁড়া গেছে।

এবার আমার মতন অবিশ্বাসীকেও লোকটি একটু টলিয়ে দিল। লোকটা আগেরগুলো আন্দাজে বলতে পারে, কিন্তু এটা জানলো কি করে। ঐ রকম বয়েসে,বোড়াল গ্রামে একটা মস্ত বড় দীঘিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে, মাঝ দীঘিতে আমার পায়ের শিরায় টান ধরেছিল। ডুবেই গিয়েছিলাম সেবার, দুজন জেলে সেখানে মাছ ধরতে এসেছিল, তারা বাঁচিয়ে দেয়। অনেক দিন আগেকার কথা।

আমি উল্টে এবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, আপনার বাড়ি কি বোড়াল গ্রামে?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি অবাক হলেন বেশী। বললেন, না তো। আমি থাকি ফার্ন রোডে। বোড়াল গ্রাম কোথায়?

—চব্বিশ পরগণায়। রাজনারায়ণ বসুর গ্রাম, পথের পাঁচালির শুটিং হয়েছিল।

—সেখানে আমি থাকতে যাবো কেন। কোনো দিন যাইও নি।

—আপনি আমার জলে-ডোবার কথা বললেন কিনা! যাক গে, আপনি হঠাৎ আমাকে এসব প্রশ্ন করছেন কেন?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন, কেন, আপনি কিছু মনে করেছেন, ভাই?

—না, না, তা করি নি। হঠাৎ আপনি আমাকে দেখে এসব বলতে লাগলেন। প্রায় সবগুলোই মিলেছে কিন্তু....আপনি বুঝি জ্যোতিষী?

—ঠিক জ্যোতিষী বলতে যা বোঝায়, তা আমি নই। তবে এই শাস্ত্রটার চর্চা করি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।তিনি এবার নামবেন। আমি আর কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে আর একবার আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম। তিনি রীতিমতন অবাক হয়েছেন। সেই অবাক-মুখ নিয়ে নেমে গেলেন তিনি।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। শখের ডাক্তারের মতন শখের হাত দেখে বা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার অতীত কিংবা ভাগ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। কয়েকটা মিলেও গেছে। কিন্তু এই সব জ্যোতিষীদেরআমি অবাক করে দিয়েছি প্রত্যেকবার। আমি তাদের কৃতিত্বে কোনো রকম সাধুবাদ দিই নি। নিজের থেকে একটাও প্রশ্ন করি নি কক্ষনো। মিলেছে তো বয়ে গেছে, এরকম একটা ভাব আমার। আমার ভাগ্য সম্পর্কে আমার কোনো রকম আগ্রহই নেই। কোনো অপ্রমাণিত তত্ত্বও আমি মানি না। ফ্রয়েড বলেছেন, কোনো কোনো লোকের খানিকটা টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকে। অনেকের যেমন স্মরণশক্তি সাঙ্ঘাতিক হয়। মেয়েরা যেমন দেড় বছর আগে কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে আমি কোন্ জামা পরে গিয়েছিলাম তা পর্যন্ত বলে দিতে পারে। এটাও সেই ধরনের ক্ষমতা। এর ফলে কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার জীবনের কিছু কথা এরা বলেদিতে পারে। কারণ সবই তো সেই লোকটির মনের মধ্যে আছে। এই জন্যই অতীতের ঘটনাগুলোই বেশীর ভাগ মেলে, ভবিষ্যতের কথা স্রেফ আন্দাজে ঢিল।

কোনো একজন লোকের সঙ্গে নতুন পরিচয় হলে তারপর তার সঙ্গেপ্রায়ই দেখা হয়। কোনো একটি নতুন শব্দ শিখলে যেমন পরের দিনই খবরের কাগজে সেই শব্দটা পাওয়া যায়।

কানে-চুলওয়ালা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেও দু'দিন পরেই বাজারে দেখা হলো।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে পরিচয় সূচক ভাবে হাসলাম। উনিও চিনতে পেরেছেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এদিকেই থাকেন বুঝি?

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, সেটাও আপনার জ্যোতিষ শাস্ত্র দিয়ে জানা যায় না?

ভদ্রলোকেও হাসলেন। তারপর বললেন, আপনার কাছে ভাই আমি একটা ব্যাপারে ঠকে গেছি। এর আগে যতজনকে দেখেছি, সবাই একটু পরে নিজে থেকে কিছু না কিছু জানতে চেয়েছে। অন্তত আমাকে পরীক্ষা করার জন্যও।

আমি বললাম, আপনি ভুল লোককে বেছেছেন। ট্রামে তো আরও অনেক লোক ছিল।

—আপনি এসব মানেন না একদম?

—মানামানির প্রশ্নই নেই। একদম মাথাই ঘামাই না।

—আমিও আগে তেমন বিশ্বাস করতুম না। একবার কাশীতে একজন—

—আপনার জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিয়েছিল তো?

—আমার নয়, আমার মেয়ের সম্পর্কে। আমি একটু ভয় পেলুম। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একটা করুণ কাহিনী শোনাবেন। মানুষেব দুঃখ-কষ্ট, এমন কি কোনো দুর্ঘটনার কাহিনী শুনতেও আমার খারাপ লাগে-এমনিই তো এসব কত চোখে দেখছি, আরও বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? ভদ্রলোকের মেয়ে বেঁচে আছে তো?

উনি বললেন, আমার একটিই মাত্র মেয়ে, লেখাপড়াতে ভালো, দেখতে শুনতেও ভালো। মেয়ের মা এমনিই শখ করে কাশীর এক সাধুর কাছে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কাশীতে আমার বড় শালার বাড়ি, সবাই মিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তা সাধু আমার মেয়েকে দেখেই বললো, এ মেয়ের বিয়ে দেবেন না! যতবারআমরা জিজ্ঞেস করি ততবারই ঐ এক কথা। এদিকে মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক। মেয়ে নিজেই তার কলেজের এক অধ্যাপককে পছন্দ করেছে, আমরাও আপত্তি করি নি, খুব ভালো ছেলে, আপত্তি করার কিছু নেইও—।

সাধুর কথা মনে একটু খটকা লেগেছিল, তাই ছেলে আর মেয়ের কুষ্ঠি মেলালাম আর কয়েকজনকে দিয়ে। সবাই বললো, চমৎকার মিল। তাই আমরা আর দ্বিধা করলাম না, বিয়ে হয়ে গেল যথা সময়ে। এক বছরের মধ্যে সেই মেয়ে বিধবা হলো!

আমার খুব কষ্ট হলো ভদ্রলোকের মেয়েটির জন্য। সে শুধু বিধবা হয়েছে।এই জন্যই নয়। তার নিশ্চয়ই এখনো মনে হয় সেই তার অধ্যাপক প্রেমিককে হত্যা করেছে। অর্থাৎ অধ্যাপককে সে বিয়ে না করলে তিনি মারা যেতেন না। এ যে সাংঘাতিক আত্মগ্লানি। যেন পৃথিবীতে আর কোনো অধ্যাপক মারা যায় না! যেন আরও কোনো মেয়ে কখনো অকালে বিধবা হয় না। মেয়েটির বুকে ঐ পাষাণভার চাপিয়ে দেবার জন্য ঐ সাধুটিই দায়ী!

ভদ্রলোক বললেন, আজকাল বিধবাদেরও বিয়ে হয়। আমরা মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি নয়। বাড়ি থেকে বেরোয় না, কারুর সঙ্গে কথাবলে না—

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ভদ্রলোক বললেন, সেই থেকেই আমার কৌতূহল। বইপত্র খুঁজে খুঁজে আমিও চর্চা করতে লাগলাম-তবে কারুর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলি না, কী দরকার মানুষকে আগে থেকে চিন্তায় ফেলার। একবারহলো কি জানেন.....

ভদ্রলোক আরও কোনো কাহিনী শোনাতে যাচ্ছিলেন, আমি সবিনয়ে বললাম, আজ চলি, নিশ্চয়ই এর পরে বাজারে মাঝে মাঝে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

প্রায় পালিয়েই গেলাম। আমি এসব কাহিনীকে সত্যিই ভয় পাই। অনেকেই মিলে যাওয়ার নানারকম ঘটনা বলে। এই মিলে যাওয়াটাই বেশী সাংঘাতিক। এক একটা ঘটনা মেলে আর কিছু লোকের ভক্তি বাড়ে। এইসব ঘটনা শুনেআমি মনে মনে একটা কথাই উচ্চারণ করি সব সময়, আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য। একটা প্রশ্নের আজও উত্তর মেলে নি। হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা পড়ে

একদিনে পঁচাত্তর হাজার লোক মরে গিয়েছিল।ঐ এক জায়গায় ওতগুলো লোকের কি একই দিনে মৃত্যুর কথা ভাগ্যে লেখা ছিল?

দশ

ধানবাদ থেকে গাড়িতে ফিরছি, বেশ রাত হয়ে গেছে। পেছনের সীটে সবাই ঘুমোচ্ছে, আমারও চোখ টেনে আসছে, ঢুলে পড়ছি মাঝে মাঝে। অমনি অমিতের কাছে বকুনি খাচ্ছি। অমিত গাড়ি চালাচ্ছে তাকে জেগে থাকতেই হবে। তার সঙ্গে আর একজন অন্তত কারুর জেগে থাকা উচিত। নিজের গায়ে নিজে চিমটি কেটে কেটেও আমি ঘুম তাড়াতে পারছি না।

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে অমিত বললো, ঐ যে!

আমি চমকে উঠে বললাম, কি!

অমিত বললো, সেই যে বলেছিলাম নিরসা'র ভূত! ঐ দ্যাখ দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে পেছনের সীটের সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। তারাও চেঁচিয়ে বললো, কই,কই!

অমিত হেডলাইট জ্বালালো। দেখা গেল বেশ খানিকটা দূরে, রাস্তার ধারে সাদা কাপড় পরা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় কোনো স্ত্রীলোক। মাথায় ঘোমটা!

পেছনের সীটের মেয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

জি টি রোডের ওপর, জায়গাটারনাম নিরসা। দু'পাশে খনি এলাকা।এখানকার একটি ভূতের গল্প অনেকদিন প্রচলিত। ভূত নয়, পেত্নী। একটি ছেলে কোলে নিয়ে রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ নাকি দেখেছে ওর কোলে যা থাকে সেটা কোনো শিশু নয়, একটা মরা শুয়োর।

অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে দূরের সেই মূর্তিটা দেখে আমারও গাটা একবার একটু ছমছম করে উঠলো। তবু বললাম, যাঃ, ওটা মানুষ নয়। নিশ্চয়ই কোনো কলাগাছ, দূর থেকে ওরকম দেখায়।

অমিত বললো, চল কাছে গিয়ে দেখছি।

পেছনের সীটের একটিনারী প্রায় আর্তচিৎকার করে বললো, খবর্দার না, ওদিকে যাবে না! গাড়ি ঘোরাও ঐ ভূতের পাশ দিয়ে গাড়ি গেলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়! আর একটি নারী সাহসিনী। সে বললো, যাঃ তা কখনো হয়! আজ সত্যি দেখবো, ওটা ভূত কিনা।

অমিত ঘড়ি দেখে বললো, ঠিক বারোটা বাজে। এই সময়েই ও আসে।

মূর্তিটা তখনো সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলাগাছ বলেই মনে হয়।

আমি কখনো ভূত দেখি নি।অনেকবার একটুর জন্যে ফস্কে গেছে। ভূত আমার কপালে সহ্য হয় না। আজ এত কাছে পেয়েও ছাড়ার কোনো মানে হয় না। একটু ভয় ভয় করলেও ভয়েতেও একটা নেশা আছে। তাড়াতাড়ি ড্যাসবোর্ড থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে এক চুমুক দিয়ে মনের জোর বাড়িয়ে নিলাম। তারপর অমিতকে বললাম, গাড়িটা আস্তে আস্তে ঐ দিকে চালা তো!

পেছনের সীটের দুটি মেয়ের প্রবল আপত্তি ও'একটি মেয়ের উৎসাহবাণী দিয়ে আমরা এগোলুম। আমার পাশে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে রজত একটাও কথা বলছে না।

গাড়িটা খানিকটা এগোবার পর স্পষ্ট বোঝা গেল, কলাগাছ নয়, একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকই বটে। মুখটা এখনোদেখা যাচ্ছে না।

—ওমা, এদিকেই আসছে।! গাড়ি ঘোরাও!

পেছন থেকে একজন এমন চিৎকার করে উঠলো যে সবাই চমকে উঠলাম। তারপর দেখলাম, স্ত্রীলোকটি হাঁটতে শুরু করেছে ঠিকই। তবে এদিকে আসছে না, রাস্তা পার হচ্ছে।

একবার দেখলাম, তার কোলে বাচ্চা বা শুয়োর-টুয়োর কিছু নেই। এমনই একজন স্ত্রীলোক,

বেশ বয়স্কা। একবার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির দিকে তাকালো। তারপর রাস্তার পাশে অন্ধকারে নেমে গেল।

তাড়াতাড়ি টর্চ বের করে জানলা দিয়ে ফেললাম। তখনো যাচ্ছে তাকে। অদৃশ্য হয়ে যায়নি। রজতকে বললাম, চল, নেমে দেখি!

রজত বললো, আমি নামবো না।

রজতটা যে এত ভীতু, তা জানতুম না।ও বসে আছে দরজার পাশে।ও না নামলে আমি নামতে পারছি না। ওকে ধমক দিয়ে বললাম, তুই সর না। আমাকে নামতে দে। রজত বললো, না, নামতে হবে না!

অমিত হো-হো করে হেসে উঠলো। দূরে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। দুপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ছিল, এবার দেখতে পেলাম একটা আলোর বিন্দু। স্ত্রীলোকটি ঐ দিকেই গেছে। নিশ্চয়ই ওদিকে কোনো বাড়ি আছে। রজতকে সরিয়ে যখন নামলাম, তখন আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

সত্যি ভূত দেখা হলো কিনা, সেটা স্পষ্ট হলো না সেদিন। অনেক রাত্রে রাস্তার পাশে একা একটি স্ত্রীলোককে দেখেছি ঠিকই। কিন্তু গাড়ির জোরালো আলোয় দেখা গেছে সে একজন মানুষই, ভয়ঙ্কর কিছু নয়, আমাদের ভয়ও দেখায়নি, কোনো ক্ষতিও করেনি। অতরাত্রে একজন স্ত্রীলোক রাস্তার ধারে কেন দাঁড়িয়েছিল, তাবোঝা গেল না। যুবতী হলেও না হয় ভাবতাম অভিসার-টভিসার ব্যাপার, এ যেএকদম বুড়ি! হয়তো পাগলীহতে পারে! এ বিষয়ে গাড়ির যাত্রিণীদের মধ্যে রীতিমতন মতভেদ রয়ে গেল।

বাকি রাস্তাটা সবাইমিলে এমন ভূতের গল্প শুরু করলো যে কারুর চোখে আর এক ফোঁটাও ঘুম এলো না।

অমিত আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোর মনেআছে সেই বীরপুর লেভেল ক্রসিংয়ের কথা?

আমার খুব মনে আছে। ভুতের জন্য সেবার আমরা দারুণ চোখ ব্যথা করেছিলাম।

সেবার আমরা ট্রাকে চেপে ঘুরছিলাম উত্তরবঙ্গ। ট্রাক ড্রাইভারদের দুতিন টাকা দিলে তারাদশ-পনেরো মাইল রাস্তা তাদের পাশে বসিয়ে পৌঁছে দেয়। একজন ট্রাক ড্রাইভারের মুখেই প্রথম শুনি বীরপুর লেভেল ক্রসিং-এর ভূতের কথা। সে একেবারে সাংঘাতিক পেত্নী। লেভেল ক্রসিং-এর পাশে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে, নাচে, ড্রাইভারদের হাতছানি দেয়। তার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে যে এগিয়ে গেছে,সে আর ফেরে নি। চার পাঁচজন লোক নাকিএইভাবে মারা গেছে।

আমরা ট্রাক ড্রাইভারটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

না, সে নিজে দেখে নি বটে, তবে তার চেনা জানা অন্য দুএকজন দেখেছে।আর লেভেল ক্রসিং-এর পয়েন্টসম্যান তো রোজই দেখে।

তারপর আরও দু'একজনের মুখে ঐ কাহিনী শুনলাম। কেউ ঠিক নিজের চোখে দেখে নি।তবে সবাই ঐ পয়েন্টসম্যানের কথা বলে। বুঝলাম, ঐ পয়েন্টসম্যানের সূত্র থেকেই গল্পটা ছড়িয়েছে।

অমিত বড্ড গোঁয়ার ধরনের ছেলে। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা বীরপুর লেভেল ক্রসিং পার হচ্ছি, অমিত হঠাৎ নেমে পড়ে বললো, আজ আমরা এখানেই থাকবো! আমার কোনো আপত্তিই শুনলো না।

আজকাল বেশীর ভাগ লেভেলক্রসিং-এর দরজাই যন্ত্রে খোলে। তবে এখানে কয়েক জায়গায় হাতে-খোলা দরজা রয়ে গেছে। বীরপুরের এ রাস্তায় রাত্তির বেলা বেশী গাড়ি চলে না। রাত ৯টা চুয়ান্নআর রাত তিনটে বাইশে দুটি ট্রেন যায়-সেজন্য সন্ধ্যে থেকেই লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ থাকে-কোনো গাড়ি বা ট্রাক এসে হর্ন দিলে খুলেদেয়।

কাছেই সাদা রঙের একটি ছোট্ট গুমটি ঘর। সেখানে একজন লোক তোলা উনুনে রুটি সেঁকছিল। লোকটির গলায় মোটা পৈতে, মাথায় টিকি। বয়সের মনে হয় গাছ পাথর নেই, তবে স্বাস্থ্যটি পেটানো। লোকটি বেশ নিরীহ, মুখে একটা ধার্মিক ধার্মিক ভাব।

অমিত ভালো হিন্দি জানে, লোকটির সঙ্গে অবিলম্বে ভাব জমিয়ে ফেললো। এমন কি শেষ পর্যন্ত

আমরা ওর বানানো রুটি এবং টিঁড়স তরকারি পর্যন্ত খেয়েছিলাম। ওর নাম রামখেলাওন, কিন্তু আমরা সংক্ষেপে রামজী করে নিলাম। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে ও বিশেষ অবাক হলো না, বেশ সহজ ভাবেই নিল।

রামজী বললো, হ্যাঁ ও লেড়কি তো হামেশাই আসে, ওকে দেখতে পাওয়া যায় তিনটে বাইশের ট্রেনের একটু আগে। ঐ জন্যই দেখবেন, রাত্রিরবেলা এখন যত ট্রাক যায়, তারা অনেক দূর থেকে হর্ন দিতে দিতে আসে, আমিআগেই দরজা খুলে দিই বলে ওরা আর দাঁড়ায় না।

—ওকে সবাই ভয় পায়?

—হ্যাঁ। বেটি বড় বদমাশ। বুকের লহু টেনে নেয়।

—তা রামজী, তোমার ভয় করে না?

—আমার কী ভয় আছে! আমি তো ওর কাছে যাই না। দূর থেকে দেখি। বহুৎ খুবসুরৎ লেড়কি।

পেত্নীটির পূর্ব ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে একটি মেয়েকে হাত পা বাঁধা মৃত অবস্থায় ট্রেন লাইনের পাশে পাওয়া গিয়েছিল। যারা মেয়েটিকে মেরে রেখে গিয়েছিল, তারা বোধহয় ভেবেছিল লাশ ট্রেনে কাটা পড়ে যাবে। কিন্তু কুকুর বা শেয়াল লাশ টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। তাই পরদিন সকালে তাকে প্রায় আস্তো অবস্থাতেই পাওয়া যায়। তার পরনে ছিল দামী শাড়ি, চেহারাও খুব সুন্দর। তার পরিচয় জানা যায় নি। সেই খুনেরও কোনো কিনারা হয় নি। সেই মেয়েটিই পেত্নী হয়ে লেভেল ক্রসিং-এর পাশে দাঁড়ায়।

এরকম গল্প হাজার হাজার শোনা যায়। কিন্তু রামজী প্রতিটি কথা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেযে শুনতে মন্দ লাগে না। বিশেষত আশেপাশে আর কোনো লোকজন নেই। ঝিমঝিম করছে রাত। ঘরের পেছনে একটা জারুল গাছ, তার পাতায় বাতাসের শব্দ হলেও গায়ে একটু কাঁটা দেয়।

রামজী আমাদের পেয়ে অনেক কথা বলতে লাগলো। লোকটি এখানে দিনের পর দিন একা থাকে—বিশ্ব সংসারে ওর কেউ নেই, যদিও ওর বাড়ি বিহারে, কিন্তু সেখানেও আর যায় না। কেন যাবে? আপনজন কেউ নেই সেখানে। এক টুকরো জমিও নেই-সুতরাং এই গুমটি ঘরটাই তার বিশ্ব সংসার।এ রকম সম্পূর্ণ একলা মানুষ আমি আগে কখনো দেখি নি। আশ্চর্য, ওর একাকীত্ব বোধও নেই। ও বেশ তৃপ্ত মানুষ, কোনো অভিযোগ নেই ওর।

ঘরের একপাশে তেল চিটচিটে কম্বলের ওপর বালিশ পাতা। তার ওপরে বসে আমি ওর উনুনে হাত সেঁকতে লাগলাম। বেশ শীত শীত ভাব আছে—যদিও মার্চের শেষ। বেশ অমিতই কথাবার্তা চালাচ্ছে, আমি শ্রোতা।

প্রতিরাত্রে রামজী সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। পাতলাঘুম। হর্নের শব্দ শুনলেইউঠে গিয়ে গেট খুলে দেয়, আবার বন্ধ করে। রাত তিনটের ট্রেনটা চলে যাবার পর একেবারে গেট খুলে দিয়েএসে ভালো করে ঘুমায়-কারণ পরের দিন সকাল এগারোটার আগে কোনো ট্রেন নেই। সেই ট্রেনটা আসবার আগেওর ঘুম ভাঙে নূপুরের শব্দ শুনে। তখন সেই মেয়েটি আসে। দূর থেকে তার হাসি শুনতে পাওয়া যায়। তখন রামজী রাম নাম জপতে জপতে গিয়ে গেট খোলে।

অমিত ঘড়িতে দেখলো সাড়ে বারোটা বাজে। আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আর জাগতে পারবো না। অমিত বললো, চল,বাইরেটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

আমার অতটা উৎসাহ নেই। ঘর থেকেই যখন সবদেখা যায়, তখন আর বাইরে গিয়ে লাভকি? চাদর মুড়ি দিয়েবসে সিগারেট টানতে লাগলাম। এক একবার মনে হতে লাগলো, ডাকবাংলোর সুন্দর বিছানা ছেড়ে এরকম ভাবে এখানে বসে থাকার কি মানে হয়?ভূত জিনিসটা যে পুরোপুরি গাঁজা,তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই! তবু কেন শুধু শুধু এই কষ্ট! অথচ একটা অ্যাডভেঞ্চারের লোভও ছাড়া যায় না। যদি সত্যি ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, তা হলে ভগবানও মেনে ফেলবো।

কথা বলতে বলতে রামজী এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আর অমিত জেগে। চোখ বাইরে। নিশ্চিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক-এক সময় দৃষ্টি বিভ্রম হয়। মনে হয় যেন

কারুকে দেখছি, কিছু যেন নড়ছে, কেউ যেন এগিয়ে আসছে। হাত দিয়ে চোখ ঘষে নিলেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়। কখনো বেশী সন্দেহ হলে বাইরে গিয়েউঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি। না, কেউ নেই। অমিত টর্চ ফেলে আগেই আশেপাশের সব কটা গাছ দেখে নিয়েছে-যাতে পরে ঐ রকম কোনো গাছকে মানুষ বলে ভুল না হয়।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। চোখ টনটন করছে। ঠিক রাত দুটোর পর আমার ঘুম আসে। এক জায়গায় বসে বসে আর কতক্ষণ জেগে থাকা যায়! কিন্তু অমিতের জেদ বেশী, ও কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না। আমার ঝিমনি এলেই ও আমার পায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়। একটা ট্রাকও আসছে না। রামজীরও গেট খোলার দরকার হচ্ছে না। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের প্রতীক্ষা তখন যেনশুধু একটি সুন্দরী মেয়ের

জন্য। পেত্নী হোক আর যাই হোক? শুনেছি সে সুন্দরী-সেই জন্যই আমরা তাকে দেখতে চাইছি। বুকের রক্ত শুষে নেয় তো নেবে, কোনো সুন্দরীর জন্য বুকের রক্ত দিতে আর আপত্তি কি?

তিনটে বাজলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম,কি রে অমিত?

অমিত বললো, ট্রেনটা আসুক-সেই পর্যন্ত অন্তত দেখা যাক। প্রত্যেকটা মিনিট কাটছে যেন এক ঘন্টা। এমন নিঃশব্দ রাত আগে কখনো কাটাই নি। কাছাকাছি কোনো জন্তু-জানোয়ার পর্যন্তনেই। একটা কুকুরের ডাকও শোনা যায় না! শুধু একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক, সেটাওযেন স্তব্ধতার অন্তর্গত।

হঠাৎ রামজী ধড়মড় করে উঠে বসলো। জড়ানো গলায় বললো, ওহি! ওহি! শুনছেন?

কি শুনবো! কোনো তো শব্দ নেই? তবু কান পেতে রইলাম।

রামজী বললো, ঘুংঘট? ঘুংঘট শুনছেন না?

কোথায় আবার ঘুঙুরের আওয়াজ? কিছুই না। জারুল গাছে ঝিঁঝির ডাক তো অনেকক্ষণ শুনছি।

—ঐ যে, ঐ যে! হাসি! বেটি হাসছে!

রামজী এব্যর বিছানা থেকে যেন লাফিয়ে উঠলো। অমিত সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেল। রামজী আমার হাত ধরে টেনে দরজার বাইরে এনে বললো, ওহি দেখিয়ে হুঁয়া-কিংনা খুবসুরৎ লেড়কী—

কিছু দেখলাম না। শেষ রাতে ময়লা ময়লা জ্যোৎস্না, তাতেও কোনো কিছুকেই চোখের ভুলে মানুষ মনে হয় না। অথচ রামজী একদিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচাতে লাগলো

আমার মনে হলো, লোকটা পাগল। গলার আওয়াজ চোখের দৃষ্টি ঠিক পাগলের মতন। ওকেই আমার ভয় করতে লাগলো।

রামজী আমার হাত চেপে ধরে বললো, দেখেন নি? নেহি দেখা আভি?

আমি আস্তে আস্তে বললাম, হ্যাঁ। দেখেছি।

অমিত লেভেল ক্রসিং-এর গেট পর্যন্ত ঘুরে এসে ধমক দিয়ে বললো, ধ্যাৎ! সব বুজরুকি! এ রামজী, তুমি কি আমাদের বুদ্ধবাক পেয়েছো?

আর কথা শোনা গেল না! একটা জোরালো আলোয় সামনেটা সাদা হয়ে গেল। ঝলমলিয়ে চলে এলো ট্রেন! রামজী গেট খুলতে গেল।

আমি অমিতকে বললাম, লোকটা পাগল। আর বেশী ঘাঁটাস নি।

রামজী যখন গেট খুলে ফিরে এলো, তখন, আবার আগেরই মতন নিরীহ আর বিনীত। বললো, দেখেন নি? একদম সামনে থি!

আমরা কোনো আপত্তি করলাম না। আমার মনে হলো, রামজী দিনের পর দিন, রাতেরপর রাত একা থাকে। ওরও তো একটা সঙ্গিনী দরকার। সে রকম কারুকে যদি না পায় তাহলে একজনকে বানিয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? ওই সুন্দরীকে ও ছাড়া আর কেউ দেখবে না।

এগার

রামপুরহাট থেকে সাত-আট মাইল দূরে তুম্বুনি নামে একটি গ্রামে গিয়ে ছিলাম ক'দিন। একদিন রাত বারোটার পর শখ চাপলো বেড়াতে বেরুবার। যদিও শীতকাল, তবু মস্ত বড় একটা চাঁদের অনেকখানি জ্যোৎস্নায় পথঘাট ঝকঝক তকতক করছে। লাল রঙের রাস্তা, ঈষৎ ঢেউ খেলানো, দূরে পেন্সিল স্কেচের মতন টিলা ও শালের জঙ্গল। খুব ভালো ভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা দলে চার পাঁচজন। অনেকটা রাস্তা হেঁটে, গানগেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমরা। মনে হলো সারা রাতই বেড়ানো যায়। আমরা প্রায় অন্য একটি গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় দেখলাম উল্টো দিক থেকে পর পর তিন চারটে গাড়ি আসছে হেডলাইট জ্বেলে। বেশ অবাকহলাম। এত রাত্রে গ্রামের রাস্তায় তিন চারটে গাড়ি? তাও তো ট্রাক নয়?

আমাদের সঙ্গে একজন স্থানীয় লোক ছিল, সে বললো, আজই এখানে একটা ফিলমের দল এসেছে বোধহয় তারাই শুটিং-এ বেরিয়েছে!

প্রথম জিপ গাড়িটা আমাদের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, বাইরের দিকে অনেকখানি শরীর ঝুঁকিয়ে বসে আছেন একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায় মানুষ, মাথা ভর্তি এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বোতল।

চিনতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হলো না। ঋত্বিককুমার ঘটক।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাস্তার ধারে ডাইভ মারলাম। খান খন্দে গড়িয়ে পড়ে সেখানেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম। দেখতে পেলেই হয়েছিল আর কি! ঋত্বিক ঘটককে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি; কিন্তু একবার উনি দেখতে পেলে আমাদের বেড়াবার দফা দফা।

গাড়িগুলো চলে যাবার পর আমরা ধুলোটুলো ঝেড়ে আবার রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এবার বোধহয় আমাদের উল্টো দিকে হাঁটা উচিত। কিন্তু চাঁদের আলোয় আমাদের নেশা লেগে গেছে, তক্ষুনি ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই কারুর। গাড়িগুলো নিশ্চয়ই অনেক দূরে যাবে, সুতরাং আমাদের ভয়ের কিছু নেই।

আরও খানিকটা পথ হেঁটে এসে, একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম, গাড়িগুলো থেমে পড়েছে, শুটিং-এর উদ্যোগ চলেছে।শোনা গেল সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের জোরালো এবং জড়ানো কণ্ঠ।

অত রাত্রেও কিছু গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করছে আস্তে আস্তে। আমাদের মধ্যে একটা মতবিভেদ দেখা গেল। এত কাছে এসেও আমরা ঋত্বিক ঘটকের শুটিং দেখার সুযোগ ছাড়াবো কিনা! আমাদের মধ্যে যে দু'একজনকে ঋত্বিক ঘটক খুব ভালো রকম চেনেন, তাদের একটুও ইচ্ছেনেই ওখানে দাঁড়াবার। কারণ উনি একবার চিনতে পারলেই আগামী দুতিনদিন ওঁর সঙ্গেই থাকতে হবে, মানতে হবে ওঁর হুকুম। ঋত্বিক ঘটকের চোখে চুম্বক আছে। তা এড়িয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। শেষ পর্যন্ত আমরা মাথায় খুব করে চাদর মুড়ি দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে গ্রামের লোকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে রইলাম। এবং খানিকক্ষণ বাদে একবার উনি খুব কাছাকাছি আসতেই আমরা পিছু হটে হটে একেবারে কেটেই পড়লাম।

পরদিন দুপুরবেলা আমরা রামপুরহাটে একটা হোটেলে খেতে গেছি। দারুণ খিদে পেয়েছে। সবেমাত্র কলাপাতা, নুন আর কাঁচলঙ্কা দিয়েছে, রান্নাঘরে ভাতের ফ্যান গালার গন্ধ পাচ্ছি, খিদের চোটে দু'এক কণা নুনই ঠেকাচ্ছি জিবে, এমন সময় দরজা ঠেলে সদলবলে ঋত্বিককুমারের প্রবেশ। দিনের বেলাতেও সেই উস্কোখুস্কো চুল, টকটকে চোখ, পাঞ্জাবির পকেট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন একটা শিশি। রাজাবাদশার মতন চেঁচিয়ে উঠলেন, কই, খাবার কোথায়?

আমাদের খাওয়া মাথায় উঠলো। ওঁর চোখ এদিকে পড়ার আগেই আমরা কলেজের ছাত্রদের মতন, পেছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়ালাম।

উনি আমাদের কাছে টাকা পেতেন না, কোনোদিন ঝগড়াও হয় নি, বরং ওঁর সঙ্গে একটা স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কই ছিল, তবু ওঁকে দেখেই কেন আমরা পালাচ্ছিলাম, তা হয়তো ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। ওঁর মধ্যে দারুণ ছটফটানি ছিল। অনেকের প্রতিভা পুরোপুরি সৃষ্টির দিকে না গিয়ে অনেকটা আত্মক্ষয়ের দিকে যায়। সেইজন্যে তিনি বহু কাজই সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এবং আত্মক্ষয়ের নেশায় যাঁদের পায়, তাঁরা কাছাকাছি অন্য কারুর ব্যক্তিত্বের কোনো তোয়াক্কা করেন না। এইসব মানুষকে দূর থেকেই বেশী শ্রদ্ধা করা যায়। পৃথিবীতে এরকম অনেক দেখা গেছে।

কিন্তু আর একটি দিন যা দেখেছি, পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেরকম দৃশ্য আর কখনো কেউ দেখেছে কিনা জানি নি। তাই সেটা এখানে লিখে রেখে যেতে চাই।

রামপুরহাটে যে ফিলমের শুটিং চলছিল, কয়েকমাস বাদে জানতে পারলাম, অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সেটা কোনোক্রমে শেষ হয়েছে। ছবির নাম 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। খবর পেলাম এক সন্ধেবেলা টলিগঞ্জের এক স্টুডিওর প্রোজেকশন হলে সেটা দেখানো হবে। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমরা দলবেঁধে সেটা দেখার জন্য ছুটলাম।

পৌঁছে দেখি ততক্ষণে ছবি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার হল ঘরে পঁচিশ-তিরিশজন লোক, আমরা পা টিপে টিপে পেছন দিকে দিয়ে বসলাম। পর্দায় দেখি ঋত্বিক ঘটকের নিজের চেহারা। পাজামা পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি না-কমানো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল, হাতে মদের বোতল। প্রথম থেকেই চমক খেলাম! কোনো ছবিতে পরিচালকের নিজের এরকম ছবি কে প্রত্যাশা করে?

আরও কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বুঝলাম, এ ছবিতে ঋত্বিক ঘটক আগাগোড়াই অভিনয় করেছেন, অর্থাৎ তিনিই নায়ক। তিনিই গল্প লিখেছেন-না, গল্প লেখেননি, নিজের জীবনটা ফোটাচ্ছেন। যাঁর জীবন কাহিনী, তিনিই নিজে অভিয়ন করেছেন এবং তিনিই পরিচালক-একসঙ্গে এই তিনটি জিনিস আর কোনো ফিলমে দেখা গেছে? এহ বাহ্য! এখানেই শেষ নয়?

ছবি চলছে এমন সময় একজন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, লাইট! এখানে লাইট কম! শুয়ারের বাচ্চা!

আমরা অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। কে কথাটা বললো, বুঝতে পারলাম না।

খানিকটা বাদে আবার চিৎকার, এ জায়গাটা আবার হোক! ঠিক হয় নি। একদম ঠিক হয় নি।

একজন কেউ বিরক্ত হয়ে বললো, আঃ কি হচ্ছে? ডিসটার্ব করছেন কেন?

—চোপ! কোন্ শুয়ারের বাচ্চা! আমি বলছি ঠিক হয় নি, আবার হোক!

আমরা অবাক। একি থিয়েটার নাকি যে আবার হবে, ঠিক করে নেবে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলবার পর আবার হুংকার, কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এটা কি ছবি? কিস্যু হচ্ছে না!

কথা বলতে বলতে লম্বা মতন লোকটি উঠে দাঁড়ালো। সেই চেহারা, সেই চুল এবং হাতে বোতল।চিনতে ভুল হবার কোনো উপায় নেই! পর্দাতে তো ঠিক ঐ চেহারাতেই নায়ককে দেখা যাচ্ছে!

টলতে টলতে উঠে উনি এগিয়ে গেলেন, মনে হলো যেন স্ক্রিনটাই ছিঁড়ে ফেলবেন। দুতিনজন শুভার্থী দৌড়ে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে বললো, ঋত্বিকদা, কি করছেন কি! বসুন!

কিন্তু অত বড় শক্তিমান মানুষটিকে ধরে রাখে কার সাধ্য! এক-একবার এসে বসছেন, আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছেন, কিস্যু হয় নি, কোন্ শালা কি বোঝে, অ্যাঁ? এসব কি হচ্ছে কি এখানে?

ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে ঋত্বিক কুমারের ছবিটা চলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন তিনি নিজে। উঠে দাঁড়িয়ে বোতলে এক-একটা চুমুক দিয়ে তিনি কখনো বলতে লাগলেন, লাইট কোথায়, অ্যাঁ? লাইটের সেন্স নেই? এই ফ্রেমটা ভাঙো না শালা? এক ফ্রেম কতক্ষণ চালাবে?

কেউ ওকে সামলতে পারছে না। উনি বারবার ছুটে যাবার চেষ্টা করছেন স্ক্রিনের কাছে, একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অনেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, থাক, থাক! ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত ঐখানেই থাক!

আমরা যেন থ্রি ডাইমেনশানাল ছবি দেখছি। পর্দায় যে ঋত্বিক ঘটককে দেখছি, তিনিই জ্যান্ত হয়ে শুয়ে আছেন পর্দার নীচে!

কিন্তু চুপচাপ থাকার পাত্র তো উনি নন। শুয়ে শুয়েই একটু বাদে উনি দারুণ জোরে নাক ডাকতে লাগলেন। এদিকে ছবি তখন দারুণ সীরিয়াস জায়গায়।জঙ্গলের মধ্যে নকশালদের ঘিরে ফেলছে পুলিস, তাদের মাঝখানে পথ হারানো নায়ক ঋত্বিক।এই সময় আসল ঋত্বিকের নাসিকা-ধ্বনিকে কিছুতেই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে নেওয়া যায় না, হাসি পেয়ে যায়। দর্শকদের মধ্য থেকে জনাচারেক উঠে গিয়ে ওঁকে চ্যাংদোলা করে বাইরে দিয়ে এলো।

বাকি সময়টা আমরা নির্বঘ্নে ছবিটা উপভোগ করলাম।

শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, বাইরের মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন তিনি। এখন অনেকটা জ্ঞান ফিরেছে। দুচোখে শুকনো জলের রেখা। মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু হলো কি! এই যে হাবিজাবি মাথামুণ্ড এতসব করলাম এতদিন, এতে কিছু হলো?

এটা একটা বিরাট প্রশ্ন, যার উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই। তবে সেই দিনই একটা কথা মনে হয়েছিল, ছায়াছবির চেয়েও জীবন্ত ঋত্বিককে অনেক বেশীদিন মনে থাকবে।

বার

হিন্দী সিনেমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সিনেমাই আমি খুব কম দেখি, তার মধ্যে হিন্দী সিনেমা সারা জীবনে ক'টা দেখেছি তা দু'আঙুলে গুণে শেষ করা যায়। রাজকাপুর বা রাজেশ খান্না, হেমামালিনী বা বৈজয়ন্তীমালা—এদের কারুকেই আমি দেখি নি, এমনই নির্বোধ আমি।

তবু পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে পেলেই আমি হিন্দী ফিলমের নট-নটীদের ছবিগুলো আগ্রহের সঙ্গে দেখি। নতুন নতুন ছবির খবর, অভিনেতাদের নামের তালিকা বা কেচ্ছা কাহিনীগুলোও পড়ে ফেলি। এর বিশেষ একটা কারণ আছে।

বছর পাঁচেক আগে আমি জামসেদপুর যাচ্ছিলাম। শীতকাল, খুব রমণীয় আবহাওয়া। ট্রেনে একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি রোগা, লম্বা ও লাজুক। লাজুক ছেলেদের আমি এক নজরেই পছন্দ করে ফেলি-কারণ তাদের মধ্যে আমি আমার নিজের কৈশোরকেও দেখতে পাই।

আমার সামনেই বসেছিল দু'জন সাধারণ ভদ্রলোক। দেখলেই বোঝা যায় সেই ধরনের চাকুরিজীবী, অফিসই যাদের ধ্যান-জ্ঞান। বস্তুত আমার অধিকাংশ রেল-ভ্রমণে আমি দেখেছি চলন্ত ট্রেনে আমার নিকটতম প্রতিবেশীরা অনবরত অফিসের গল্পই করে গেছে। একটানা, একঘেয়ে শুধু অফিসচর্চা। তাও জোরে জোরে। এরা একবারও ভাবে না যে এদের কাছাকাছি লোকেদের এই গল্প শুনতে বাধ্য করা অন্যায়।

এই সব লোকদের হাতে কখনো এক-আধটা সিনেমা পত্রিকাও থাকে। কথা বলতে বলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেলে সেই পত্রিকার পাতা ওল্টায়। পত্রের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঐ পর্যন্ত। ট্রেনে উঠে এরা নিজেরা খবরের কাগজ কেনে না, অন্যেরটা চেয়ে নেয় এবং সেটা দুমড়ে মুচড়ে নিজেরা নেমে পড়ার ঠিক আগে ফেরত দেয়।

সেবার আমার সামনের লোক দুটিও এই রকমই ছিল। হাওড়া থেকেই শুরু হয়েছে অফিসের গল্প, খড়গপুরেও শেষ হয় নি। তাদের অফিসের বড়বাবুটি যে অতি পাজী, দাঁত দিয়ে নোখ কাটে, দরকারি কাগজপত্র ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলে।এসব ব্যাপারে দু'জনেই একমত, তবু এত আলোচনার যে কী আছে, তা বুঝি না। শুনতে শুনতে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

এদের মধ্যে একজন বাথরুমে গেলে, অন্য জন তার হাতের সিনেমা পত্রিকাটি খোলে। পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখে। তার সঙ্গীটি ফিরে এলে সে একটা ছবি দেখিয়ে বলে, দ্যাখো, মুখার্জি, অমিতাভ বচ্চন কী অদ্ভুত মেক-আপ নিয়েছে, বোঝাই যায় না!

আমার পাশের রোগা, লম্বা লাজুক ছেলেটি এতক্ষণ নির্বাক হয়ে ছিল। এবারু সে একটু নড়ে চড়ে বসলো। ওরা যখন অমিতাভ্ বচ্চনকে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করতে লাগলো, তখন ছেলেটি হঠাৎ ফস্ করে বলে ফেললো, ওটা অমিতাভ্ বচ্চনের ছবি নয়!

লোক দুটি প্রথমে একটু অবাক হলো। তার পর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, এই তো তলায় লেখা আছে—

ছেলেটি বললো, ওটা ভুল ছাপা হয়েছে। ওটা আসলে বিনোদ মেহ্রা। দেখছেন না, ওর পাশের লোকটিকে বেশী লম্বা দেখাচ্ছে! তা কখনো হয়? অমিতাভ্ বচ্চন এখন সবচেয়ে লম্বা হীরো।

—তা বলে কি সিনেমার বইতে ভুল লিখবে?

—হ্যাঁ, ভুলই লিখেছে। আমার কাছে অমিতাভ্দার সই করা ছবি আছে। আমি চিনবো না? আপনারা যেটা দেখছেন, সেটা হচ্ছে দুনিয়া কাহানি ছবিতে বিনোদ মেহ্রা আর প্রাণ আর শায়রা বানু। অমিতাভ্ বচ্চনের নতুন ছবি হচ্ছে এই, এই , এই, এই....

হিন্দী ছবির প্রসঙ্গে লাজুক ছেলেটি সরব হয়ে উঠেছে। নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এখন অনেক ছেলে মেয়েরেই জ্ঞান ভাণ্ডার ঐ সব তথ্যেই পরিপূর্ণ। আমার চেনা একটি মেয়ে আছে, যাকে হিন্দী ফিলমের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়, প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম তার মুখস্থ। অনেক সময় অন্যরা তর্ক বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত ঐ মেয়েটিকে বিচারক বানায়।

এই ছেলেটিও নিতান্ত কম যায় না। উল্টো দিকের লোক দুটিকে সে গড় গড় করে বহু খবর শুনিয়ে দিল, মনে হলো যেন হিন্দী চিত্রজগতের সবাই তার খুব চেনা। কেননা সে সব চিত্রতারকাকেই দাদা দিদি বলছে।

খানিকক্ষণ পরে সামনের লোক দুটি আবার অফিসের কথায় ফিরে গেল। ওরা তেমন অল্পবয়েসী নয়, তাই সিনেমার গল্পের চেয়ে অফিসের গল্পই ওদের কাছে বেশী মুখরোচক।

আমি আমার পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস কররাম, তোমার নাম কি ভাই?

—জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

—তুমি এদিকে কত দূর যাবে?

—বম্বে।

—বেড়াতে?

—না, ঠিক বেড়াতে নয়। আমি ওখানেই থাকবো।

—ওখানে আত্মীয় স্বজন কেউ আছে বুঝি?

—না।

তখনই আমার একটু একটু সন্দেহ হতে শুরু করলো। একটু পরেই নিঃসন্দেহ হলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের এই ছেলেটি ভাগ্যান্বেষণে বোম্বাই যাচ্ছে। ফিলমে নামতে চায়।

ব্যাপারটা আমার কিছুই খারাপ লাগলো না। খুবই স্বাভাবিক মনে হলো। অনেক মানুষেরই একটা ইউটোপিয়া দরকার। এক সময় মানুষ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে যেত। এখন আর পৃতিবীতে অনাবিষ্কৃত দেশ নেই। গুপ্তধনের সন্ধানেও মানুষ কত জায়গায় গেছে, আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে সোনা পাওয়া যায়। কাটাকাটি করেছে। না খেয়ে মরেছে। এই কিছুদিন আগেও বাঙালীদের ধারণা ছিল বার্মায় গেলেই কোনো না কোনো চাকরি পাওয়া যায়, তাই লক্ষ লক্ষ বাঙালী সেদিকে ছুটেছিল। এখন ছেলেরা কোথায় যাবে? সকলেই তো আর বাপ-মায়ের অধীনে থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে চায় না। এখন বোম্বাইয়ের ফিলম জগতই একমাত্র ইউটোপিয়া, যেখানে সুযোগ পেয়ে গেলেই সব সুখের উপকরণ করায়ত্ত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, বোম্বাইতে তোমার চেনাশুনো নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছে? অমিতাভ বচ্চন তোমাকে সই করে ছবি পাঠিয়েছেন যখন....

ছেলেটি লাজুকভাবে হেসে বললো, না, সেরকম চেনা কেউ নাই। অমিতাভ্‌দা তো আমাকে চেনেন না। আমি স্টুডিও থেকে ওঁর একটা ছবি কিনেছিলাম, তারপর উনি একবার কলকাতায় এসেছেন, আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলের গেটের সামনে ওঁর সামনে দৌড়ে গিয়ে বলেছি, একটা সই করে দিন! অমিতাভ্‌দা কী বলেছিলেন জানেন ঃ বলেছিলেন, একদিন তোমার সই-ও অন্য লোকে নেবে!

সেই কথাতেই নিশ্চয়ই ছেলেটির মাথা ঘুরে গেছে। তারপর থেকে রোজ স্বপ্ন দেখছে, সেও একদিন নায়ক হবে। ওর নাম হবে জয়ন্তকুমার! ভালোই তো নাম।আরকেউ আছে এই নামে? পত্র-পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হবে, শুটিংয়ের অবসরে জয়ন্তকুমার-তাতে দেখা যাবে পারভীন ববি ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আছে কিংবা গলা জড়িয়ে ধরে হাসছে নিতু সিং। দারুণ ব্যাপার।

ছেলেটির চেহারা নায়কোচিত নয়। লম্বা বটে কিন্তু কোমর ও বুক প্রায় সমান। মুখখানা লম্বাটে। ও নিজে নিশ্চয়ই এসব জানে না। যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তখন নিজের চেহারাটা ও নিশ্চয়ই অবিকল অমিতাভ্‌ বচ্চনের মতনই দেখে।

ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এমনি এমনি যাচ্ছো, কি করে সুযোগ পাবে?

—রিসিদাকে কয়েকখানা চিঠি দিয়েছিলাম-তারপর উনি উত্তর দিয়েছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

—রিসিদা কে?

ছেলেটির উচ্চারণ ভালো না। হৃষীকেশ মুখার্জিকে ও বললো, রিসিকেশ মুখার্জি। এইউচ্চারণ নিয়ে ও সিনেমার নায়ক হবে? ও, বাংলা সিনেমা তো নয়,হিন্দী।

—তুমি হিন্দী জানো?

—খানিকটা জানি, আরো শিখে নেবো। উর্দুও শিখতে হবে। 'অমর প্রেমে' রাজেশদার সব ডায়ালগ আমার মুখস্থ!

হিন্দী ও শিখতে পারবে ঠিকই। কারণ 'অমর প্রেম' কে ও উচ্চারণ করলো 'আমার প্রেম'।ঠিক হিন্দী ধরনের। আমার পরিচিতা সেই মেয়েটি, যে হিন্দী ফিলমের এনসাইক্লোপিডিয়া, সে একবার শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান বলেছিল দেবানন্দপুর।আমাদের মতন দেবানন্দপুর উচ্চরণ করতে সে ভুলেই গেছে।

আর বেশী কথা না বাড়িয়ে আমি বই পড়ায় মন দিলাম। ছেলেটি রাত্রে ঘুমোবার জন্য ওপরের বাঙ্কে বিছানা পাতলো। বিছানা মানে শুধু একটা চাদর আর বালিশ। একবার যেই সে গায়ের জামাটা খুললো, দেখতে পেলাম তার গেঞ্জিটা ছেঁড়া, বুকের হাড় পাঁজরা স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ বুকের মধ্যে সে অনেক স্বপ্ন পুষে রেখেছে।

কোমরে একটা সুতোয় বাঁধা সুটকেসের চাবি। সেই চাবি নিয়ে সে তালা খুলতে গেল, অনেকক্ষণ ঘটাঘট করেও পারলো না। নিজের সুটকেসের তালা সে খুলতে পারছে না। অসহায় ভাবে এদিকে ওদিকে তাকালো।

প্রত্যেক ট্রেনের কামরাতেই একজন করে করিৎকর্মা লোক থাকে। একজন লোক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পারছেন না? দিন, চাবিটা আমাকে দিন!

সে একবার ঘুরিয়েই কট করে খুলে দিল।

আমার তখন মনে হলো, যে ছেলে নিজের সুটকেসের তালা খুলতে পারে না, যারা এ রকম হাড় জিরজিরে চেহরা, কথাবার্তাতেও চাকচিক্য নেই, সে বোম্বাইয়ের বিশাল প্রতিযোগিতার জগতের মধ্যে পড়ে কী করবে? এ রকম কত হাজার হাজার ছেলে সেখানে মাথা ঠুকে মরেছে। এই ছেলেটা বাঁচতে পারবে? সেখানকার হাঙর-কুমীররা ওকে বাঁচতে দেবে?

কিন্তু ওর বয়েস উনিশ-কুড়ি কিংবা বেশীও হতে পারে। এই বয়েসের একটি ছেলে যদি নিজের ভালো মন্দ বুঝতে না পারে, তবে আর কবে বুঝবে? মায়ের আঁচলের তলায় পুতুপুতু হয়ে থাকবে! প্রায় এই বয়েসেই আলেকজান্দর নামে এক ছোকরা বিশ্ব বিজয়ে বেরিয়েছিল। এই ছেলেটা যদি ভুল

করে, তার ফল ওকেই ভোগ করতে হবে, তাই করুক, নিজে নিজেই শিখুক বুঝুক, এই পৃথিবীটা কী রকম।

জামসেদপুরে নামবার সময় আমি ছেলেটির মুখ ভালো করে দেখে নিলাম একবার

তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে। পত্র-পত্রিকায় আমি ছেলেটির ছবি কিংবা কোনো খবর থাকে কিনা খুঁজে দেখি। পাই না। আমার পরিচিতা সেই জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, জয়ন্তকুমার নামে নতুন কেউ নেমেছে? অন্তত ছোটখাটো কোনো পার্টে?

সে বলে, না তো।

ছেলেটির পাঁজরা-বার-করা বুক আর লাজুক মুখখানা মনে পড়ে যায়।

তের

ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় একজন ম্যাজিসিয়ান থাকতেন। রোগা, লম্বাটে চেহারা, একটা চোখ একটু লক্ষ্মী-ট্যারা, সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল তাঁর চুল। তখন তাঁর সেই চুলের কোনো তুলনা খুঁজে পেতাম না। এখন বলা যায়, তাঁর চুল ছিল অবিকল সাঁইবাবার মতন!

তাঁর নাম ছিল কিউ সি সরকার। কিউ দিয়ে যে কারুর নাম আরম্ভ হয়, তা আমরা জানতাম না। তখন অবশ্য ম্যাজিসিয়ান বলতেই বোঝাতো পি সি সরকরকে। আমাদের পাড়ার এনারও পদবী সরকার, সেই হিসেবে ম্যাজিসিয়ান হিসেবে এঁর যোগ্যতা আছেই। আর পি এর কিউ বলেই বোধ হয় তিনি নিজে ঐ রকম নাম নিয়েছেন। যদিও পি সি সরকারের সঙ্গে এর কোনো আত্মীয়তাই ছিল না।

প্রথম প্রথম আমরা এঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। তেত্রিশ নম্বর বাড়ির একতলায় ভাড়াটে হয়ে এসেই ইনি বাড়ির দরজায় বড় বড় করে নিজের নাম লেখা সাইনবোর্ড লাগালেন।এবং এমন ভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন যেন পাড়ার কারুর সঙ্গে ইনি কথাটথা বলে সময় নষ্ট করতে চান না। আমরা কৌতূহলী হয়ে ঐ বাড়ির কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি মারতাম। ঐ বাড়িতে উনি ছাড়া ওঁর মা, দুই বোন ও একটি বুড়ো চাকর ছিল। বুড়ো চাকরটি কিউ সি সরকারকে ডাকতেন ছোটকুবাবু বলে। পরে, আমরাও ওঁকে ছোটকুদা বলে ডাকতাম। আমরা দারুণ সম্ভ্রমের চোখে ওঁর দিকে তাকাতাম। একজন জলজ্যান্ত ম্যাজিসিয়ান, আমাদেরই পাড়ায়!

ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হয় স্বরস্বতী পুজো উপলক্ষে। চাঁদা চাইতে গিয়েছিলাম, উনি বললেন, আমি তো চাঁদা দিই না। তবে—

চাঁদা না দিয়ে আমাদের হাত থেকে কারুর পার পাবার উপায় নেই। সে ম্যাজিসিয়ান হোক আর যাই হোক। কিন্তু ওঁর পরের কথাটা শুনে আমরা চাঁদার কথাটা সত্যিই ভুলে গেলাম। উনি বললেন, চাঁদা আমি দেবো না।তবে তোমাদের ফাংশানে আমি বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখাবো। আমি সাধারণত এক-একটা শো-তে ফাইভ হাণ্ড্রেড নিই, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তো আর টাকা নিতে পারি না। শুধু স্টেজ সাজাবার জন্য আমাকে পঁচাত্তরটা টাকা দিও!

পাড়ার প্রথম ফাংশানে ছোটকুদা ভালোই খেলা দেখিয়েছিলেন। ওঁর দু বোনই ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। খালি টুপী থেকে এক ডজন রুমাল আর পায়রা বার করা, একটা দড়িকে কাঁচি দিয়ে টুকরো করে আবার জোড়া লাগানো, একটা জাপানী হাতপাখাকে গোলাপ ফুলের তোড়া বানিয়ে ফেলা—এসব বেশ চমকপ্রদ। সবচেয়ে মজা পেয়েছিলাম, যখন উনি নিজের মাথার চুল থেকে পরপর পাঁচটা মুর্গীর ডিম বার করে ফেললেন।

শুধু একটা খেলার ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে থেকে উনি আমাদেরই এক বন্ধু আশুকে ডেকে বললেন প্যাকেট থেকে একটা তাস তুলতে। তারপর কারুকে না দেখিয়ে সেই তাসটা রেখে দিতে একটা টুপীর নীচে। একটু পরেই তাঁর এক বোন টুপীটা তুলে সকলকে দেখালো যে তাসটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর ছোটকুদা একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে গুলি ছুঁড়লেন একটা ব্লাক

বোর্ডের দিকে। অমনি দেখা গেল যে সেখানে একটা তাস আটকে গেছে। ছোট কুদা আশুকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তো সেই তাসটা?

আশু চিৎকার করে বললো, মেলে নি!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

ছোটকুদা এমন কটমট করে আশুর দিকে তাকালেন যেন ওকে ভষ্ম করে দেবেন কিংবা হিপ্নোটাইজড করে ফেলবেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, নেক্সট নাম্বার!

আমরা অবশ্য ভাবলাম, আশু মিথ্যে কথা বলেছে। আশু কিন্তু বারবার মাথা নেড়ে বলেছিল, না মেলে নি, সত্যি মেলেনি! কিন্তু তাসটা তো আশু ছাড়া আর কেউ দেখে নি, তাই সত্যি মিথ্যে বোঝায় উপায় রইলো না।

আশুকে অবশ্য পরে এর ফল ভোগ করতে হয়েছিল।

ছোটকুদার সঙ্গে এর পরে আমাদের ভালোই আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ঘাটে উনি আমাদের ছোটোখাটো ম্যাজিক দেখাতেন। পেয়ারাওয়ালার ঝুড়ি থেকে উনি একটা পেয়ারা তুলে নিয়ে নিজের ছুরি দিয়ে সেটা কাটলেন। দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে একটা সিকি! আর একটা কাটলেন, তার মধ্যে একটা আংটি! পেয়ারাওয়ালার চোখ ছানাবড়া। সে পেয়ারার ঝুড়িতুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। জানি না, পরে তার কী অবস্থা হয়েছিল।

একদিন আমরা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি, ছোটকুদা এসে আশুর পকেট থেকে পেনটা হঠাৎ তুলে নিয়ে বললেন, এটা কী কলম রে?

কলমটা খুবই দামী। আশুদের বাড়িতে অনেক পুরোনো আমলের জিনিস আছে। কলমটার নাম 'ওয়াটরম্যান', বিলিতি, পেছন দিকটা ঘোরালে নিবটা ভেতরে ঢুকে যায়। এরকম কলম আজকাল পাওয়াই যায় না।

ছোটকুদা কলমটা ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, দেখবি, এটা তোদের সকলের চোখের সামনে অদৃশ্য করে দেবো? আমরা সমস্বরে বললাম, দেখি দেখি!

ছোটকুদা ডান হাতে কলমটা মুঠো করে ধরে হাতটা ওপরে তুলে কয়েকবার ঘুরিয়ে বললেন, হুস! তারপর হাত তুলে দেখালেন। আমরা মুগ্ধ।

এরপর ছোটকুদা অন্যান্য কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে আশু বললো, কলমটা দিন!

ছোটকুদা বললেন, সেটা তো হাওয়া করে দিয়েছি। ফিরিয়ে আনার কথা তো বলিনি!

ব্যাপারটা আর হাসি ঠাট্টার পর্যায়ে রইলো না। ছোটকুদা কলমটা কিছুতেই দিলেন না। আমরা শেষ পর্যন্ত ছোটকুদার বডি সার্চ করলাম। কলমটা তবু পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত এটা অনেক দূর গড়ালো। আশুর কাকা ঘটনাটা জানতে পেরে ছোটকুদার বাড়িতে এসে কলমটা চাইলেন। উনি তবু দিলেন না। বরাবর বললেন, সেটা হাওয়া হয়ে গেছে তো আমি কি করবো? আশুর কাকা রেগেমেগে বললেন, জোচ্চোর!

প্রোফেসার কিউ সি সরকার ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গেএর পর আর আমাদের সদ্ভাব রইলো না। পাড়ার আরও কয়েকজনের মুখ থেকে শোনা গেল, ছোটকুদা নাকি নানা ছুতোয় তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন, ফেরৎ দেবার নামটি নেই। নেহাৎ ছোটকুদার দুই বোনই বেশ সুন্দরী এবং শান্ত স্বভাবের, তাই ওঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে কেউ হাঁমলা করেনি। দুই বোনের নাম চাম্পা আর শম্পা, দুজনেই ডায়াসেসানে পড়ে।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হলো এর পর। দীপুদের বাড়ির অনেক দিনের পুরোনো ভাড়াটে উঠে যাবার পর সেখানে নতুন ভাড়াটে এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম ভদ্রলোক অবাঙালী। কারন, ইনি দরজায় নেম প্লেট লাগালেন, ডি কুমারকৃষ্ণ।

দুদিন বাদেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে জানলাম, উনিও একজন ম্যাজিসিয়ান এবং বাঙালীই। নামটা

আসলে কুমার কৃষ্ণ দাস, কিন্তু দাস-ঘোষ-বোস-গাঙ্গুলীরা কক্ষণো ম্যাজিসিয়ান হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হয় না বলে ইনি নামটা ঘুরিয়ে নিয়েছেন। একই পাড়ায় দু'জন ম্যাজিসিয়ান!

কয়েকদিনেই টের পাওয়া গেল ডি কুমারকৃষ্ণের নামডাক বেশী। প্রায়ই বাইরের লোকেরাগাড়ি করে এসে ওঁকে নিয়ে যায়, উনি ঝলমলে রেশমী পোশাক পরে গম্ভীরভাবে গাড়িতে ওঠেন।

ছোটকুদার সঙ্গে ডি কুমারকৃষ্ণের ভাব হলো না। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। ছোটকুদা দীপুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকান।

আশুর তখনো ওয়াটারম্যান কলমটার জন্য শোক ছিল। একদিন সে ডি কুমারকৃষ্ণের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলে দিল। উনি একেবারে ছি ছি ছি করে উঠলেন। বারবার বলতে লাগলেন, ইস, ছেলেমানুষদের সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে!

ডি কুমারকৃষ্ণ সত্যিই খুব ভদ্রলোক। ব্যবহার চমৎকার। বাড়িতে ওঁর মা ছাড়া আর কেউ নেই, আমরা গেলেই কিন্তু চা বা মিষ্টি খাওয়ান। উনি যে ম্যাজিকেও ভালো জানেন, তার প্রমাণ উনি যখন তখন খেলা দেখিয়ে আমাদের চমকে দেন না, অনেক সাধ্যসাধি করলে একটা কিছু দেখান—তারপরই বল্লেন, এমন কিছুই নয় শুধু প্র্যাকটিস, শুধু হাত সাফাই! এই বলে এক টিপ নস্যি নেন। ওর খুব নস্যির নেশা!

আমরা ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আশুর কমলটা ফেরত এনে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

উনি বলেন, না সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে দেখো ও নিশ্চয়ই বাড়ি বদলাতে চেষ্টা করবে। এ-পাড়া ছাড়বে।

—কেন? কেন!

—এক পাড়ায় দুই ম্যাজিসিয়ানের স্থান হয় না। আমি তো আর বাড়ি বদলাচ্ছি না!

একদিন ডি কুমারকৃষ্ণ বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় গলিতে ছোটকুদাকে দেখেই আমরা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম। বললাম, আপনার সঙ্গে ডি কুমারকৃষ্ণের আলাপ হয় নি? উনি খুব বলছিলেন আপনার কথা—

ছোটকুদা কিছুতেই আসতে চান না, কিন্তু আমাদের চার পাঁচজনের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন কেন? ডি কুমারকৃষ্ণ নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বললেন, নমস্কার!

ছোটকুদা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডি কুমারকৃষ্ণ আবার বললেন, আপনার তো বয়েস অনেক কম বলেই শুনেছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে চুল পেকে গেছে?

ছোটকুদা নিজের মাথায় জঙ্গলের মতো চুলে হাত দিয়ে বললেন, কই না তো! কে বললো আমার চুল পেকেছে।

—এই তো, দেখুন না!

কুমারকৃষ্ণ ছোটকুদার মাথা পট করে একটা চুল ছিঁড়ে আনলেন। সত্যি পাকা চুল।

ছোটকুদা রীতিমতন রেগে গেছেন, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারছেন না। কুমারকৃষ্ণ আবার আর একটা চুল ছিঁড়ে আনলেন। সেটা পাকা। আমরা দেখলাম, ছোটকুদার কানের দু'পাশে বেশ কিছু চুল হঠাৎ পেকে গেছে। কালও দেখি নি। জিনিসটা নিশ্চয়ই ম্যাজিক, কিন্তু চোখের নিমেষে কি করে এটা হয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না। ছোটকুদাও বুঝতে পারলেন না।

ছোটকুদা এতই ঘাবড়ে গেছেন যে উল্টে নিজে যে কুমারকৃষ্ণকে কোনো ম্যাজিকের খেলা দেখাবেন তাও পারছেন না। তাছাড়া চুল সম্পর্কে ওঁর দারুণ দুর্বলতা।

ছোটকুদা দু'হাত দিয়ে মাথায় চুল চেপে ধরলেন। তখন চুলের মধ্য থেকে একটা কৌটো বেরিয়ে এসে টক করে মাটিতে পড়লো। ডি কুমারকৃষ্ণের নস্যির কৌটো।

কুমারকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, এটা আবার মাথার মধ্যে লুকলো কি করে?

তখন আমাদের মনে পড়লো, আশুর পেনটা হাওয়া করার দিন আমরা ছোটকুদার বডি সার্চ করলেও চুলটা দেখি নি। সে কথা মনেই পড়ে নি। ওঁর চুলের মধ্যেও তো অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা যায়।

ছোটকুদার তখন একেবারে নাজেহাল অবস্থা। কুমারকৃষ্ণ আর কিছু করলেন না, হাসতে হাসতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, একটু তামাশা করছিলাম। মাথায় একটু কেরসিন তেল মেখে স্নান করে নেবেন, চুল আবার ঠিক হয়ে যাবে!

এরপর ছোটকুদার আর পাড়াতে মুখ দেখাবার অবস্থা রইলো না। সবার মুখে মুখে গল্পটা চালু হয়ে গেল। ছোটকুদা ম্যাজিকে ডি কুমারকৃষ্ণর কাছে হেরে গেছে! আমরা দূর থেকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি, দু-ও!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটকুদারই জিত হলো। কি করে যেন ছোটকুদার বোন শম্পার সঙ্গে কুমারকৃষ্ণের প্রেম হয়ে গেল খুব। উনি একদিন কাঁচুমাচুভাবে ছোটকুদার কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানাতে গেলেন।

চম্পা কিংবা শম্পাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছি খুব কম। কলেজে যায় আর আসে। আর কুমারকৃষ্ণেরও বেশীর ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকেন না, প্রায়ই কলকাতার বাইরে যেতে হয় তাঁকে। তবু কুমারকৃষ্ণের সঙ্গে শম্পার কোন্ উপায়ে প্রেম হতে পারে, তা আমাদের মাথাতেই ঢুকলো না।

এই প্রেমটাও আমরা একটা ম্যাজিক হিসেবেই ধরে নিলাম! এমন কি, এরপর থেকে সব প্রেমকেই আমার ম্যাজিক মনে হয়।

চৌদ্দ

আমি মাঝে মাঝে এমন বাড়িতে যাই যে বাড়িতে বিরাশীটা দরজা, একশো ছাপ্পান্নটা জানলা, নব্বই জন দাস-দাসী, আটচল্লিশটা মোটর গাড়ির জন্য ছত্রিশজন ড্রাইভার। না, এটা কোনো রাজা মহারাজার বাড়ি নয়, আজকাল সেরকম রাজা মহারাজাই বা কোথায়? শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলে সার ফ্রান্সিসের বাড়িতে তাঁর একার জন্যই একশো সতেরো জন দাস-দাসী ছিল, সে সব দিন আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। আজকাল যাকে বলে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হু হু করে উঠছে এই রকম সব বাড়ি, শহরের আকাশ রেখা বদলে যাচ্ছে। এগুলিকে ঠিক বাড়ি না বলে নাম দেওয়া উচিত গৃহপুঞ্জ, কারণ প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টেরই মালিক আলাদা আলাদা পরিবার। এই সবগৃহপুঞ্জে গড়ে উঠেছে এক নতুন সমাজ।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যেতে শুরু করেছে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই। এখন ছোটখাটো ছিমছাম সংসারই সবার পছন্দ। অনেক পুরোনো আমলের বাড়িতে এখনো এক পরিবারের লোক একই ছাদের নীচে থাকে অবশ্য কিন্তু সে সব বাড়িতেও অনেকগুলি রান্নাঘর। অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা ঢোকার দরজা। বাইরে দেখা হলে হেসে কথা হয় বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে চলে পরস্পরের ঐশ্বর্য বা অহঙ্কার নিয়ে খুব মুখরোচক নিন্দে।

এই আকাশচুম্বী গৃহপুঞ্জগুলিতে আবার গড়ে উঠেছে এক নতুন রকমের যৌথ পরিবার। এখানে প্রতিটি ফ্ল্যাটই স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু সিঁড়ি একটা, লিফটও একই। যাওয়া আসার পথে দেখা হয় এবং দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে দেখা হলে নিরেট মুখ করে থাকা যায় না, দুটো একটা ভদ্রতার কথা বলতেই হয়, ক্রমশ আলাপ পরিচয়, কার কোন্ চাকরি বা ব্যবসা সেই খোঁজ খবর, তারপর একদিন চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

এই সব বাড়িতে আলাপ পরিচয়ের ভাষা ইংরেজি। প্রথম প্রথম সিঁড়িতে দেখা হলে ভুরু নাচিয়ে বলতে হয়, হ্যালো—! যারা একটু আমেরিকানামনস্ক, তারা বলে, হাই! এবং এর পরেই পাক্কা সাহেবদের মতন আবহাওয়া আলোচনা। 'ভেরি সালট্রি ওয়েদার টু-ডে' কিংবা 'ইটস্ গোয়িং টু বি রেইনিং এগেইন...' ইত্যাদি। বাঙালী ছাড়াও এই সব বাড়িতে থাকে মাদ্রাজী, কেরালিয়ান, পাঞ্জাবী,

হরিয়ানী, বিহারী, গুজরাতী, মারোয়াড়ী– না, ভুল বললাম, মারেয়াড়ী নয়! মাড়োয়ারীরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে যাবে কোন দুঃখে? পুরো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউই তো তাদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মধ্যে আরও বেশী নিবিড় যোগযোগ ঘটে বাচ্চাদের মাধ্যমে। বাচ্চারা ভাষার ব্যবধান মানে না, এবং অন্য কেউ ইনট্রোডিউস না করিয়ে দিয়ে কথা না বলার বৃটিশ কায়দা জানে না। দু-একদিনেই তাদের ভাব হয়ে যায়, তারপর তারা সিঁড়িতে দৌড়োদৌড়ি করে, নীচ তলায় খেলে এবং বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই অন্যের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়। বাচ্চাদের মধ্যে বেশী ভাব হয়ে গেলে, তাদের মায়েদের মধ্যেও ভাব হয়। এবং কান টানলে মাথা আসার মতন তাদের বাবারাও কাছাকাছি আসে।

আবার সমস্যার শুরু করে এই বাচ্চারাই। মায়েরা নিজেদের বাচ্চার দোষ চট করে দেখতে পায় না। প্রেমের চেয়েও মাতৃস্নেহ বেশী অন্ধ। তিনতলার সাউথ ফেসিং এর মা ভাবলেন ছ'তলার ইস্ট ফেসিং-এর বাচ্চাটা বড্ড পাকাপাকা কথা বলে, ওর সঙ্গে তাঁর ছেলের না মেশাই ভালো। আবার ছ-তলার সেই মা ভাবলেন আটতলার বাচ্চাটা বই চুরি করে। তিনতলার ছেলে যখন ছ-তলার ফ্ল্যাটে খেলতে যায়, তার মা একটু বাদেই কোনো ছুতোয় তাকে ফিরিয়ে আনেন। আবার আটতলার বাচ্চাটি অন্য কোনো ঘরে এসে তার খেলার সাথীর বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই মায়েরা তার দিকে খর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এইসব কথাও চাপা থাকে না, ছড়িয়ে যায় এক সময়। তারপর সিঁড়িতে বা লিফটে সংশ্লিষ্ট মায়েদের দেখা হয়ে গেলে মুখ গোমড়া থাকে। চেঁচিয়ে ঝগড়া করা উঠে গেছে কিনা আজকাল!

একদিন আমি ঐ বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখলাম একটি তরুণ ও তরুণী গল্প করতে করতে হাত ধরাধরি করতে করতে উঠছে। আমাকে দেখেই তারা হাত ছেড়ে দিল, সেটা লক্ষ্য করেই আমি তাদের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম। সিঁড়িতে হাত ধরাধরি করে ওঠা দোষের কিছু নয়, আর আমিও কোনো গুরুঠাকুর নই যে আমাকে সমীহ করতে হবে! তা হলে, নিশ্চয়ই ওরা প্রেমিক প্রেমিকা, কেননা খাঁটি প্রেমিক প্রেমিকারাই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ছেলেটা বাঙালী, মেয়েটি দক্ষিণ ভারতীয়। আমি খুব সঙ্কুচিতভাবে ওদের পাশ দিয়ে নেমে গেলাম।

তখনই আমার মনে হলো একটা বাড়িতো যদি চল্লিশটা অপরিচিত পরিবার থাকে, তাদের মধ্যে অনেক কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী-এদের মধ্যে তো প্রেম হতেই পারে। ট্রেনের কামরায় কিংবা জাহাজে কয়েকদিনের যাত্রায় প্রেম হতে পারে, আর এ তো এক বাড়িতে মাসের পর মাস থাকা। এই সব প্রেমের পরিণতি হিসেবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিয়েও হবে—তাহলে একই ছাদের তলায় শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি? সেও না হয় হলো, কিন্তু তারপর যদি বিচ্ছেদ হয়? তখনও একই বাড়িতে? দুজনের প্রেমের মাঝখানে এলো তৃতীয় ব্যক্তি, প্রেম ভেঙে গেল-এর পর দুঃখ অভিমানে কেউ কারুর মুখ দেখে না সাধারণত। কিন্তু এখানে তো তার উপায় নেই। সিঁড়িতে বা লিফটে কখনো না কখনো দেখা হবেই। এমনকি কোনো মেয়ে হয়তো দেখবে তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পাশে অন্য কোনো মেয়ে। সে যে বড় মর্মান্তিক। জানি না, কিভাবে মানিয়ে নেবে।

আমি যাই আটতলায় বিনায়কদার কাছে। উনি বহুকাল মেশে হোস্টেলে মানুষ, বিয়ে করার পরও মনোমতন ফ্ল্যাটটি পান নি কখনো। অফিস থেকে ধার নিয়ে গুরুসদয় রোডে এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। আটতলা শুনে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই আঁতকে ওঠে।যদি যখন তখন লিফট বন্ধ হয়ে যায়! সিঁড়ি ভেঙে আটতলায় উঠতে হবে? বিনায়কদা ভয় পান না, উনি বলেন, কত জায়গায় কত উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠেছে, কাঠমাণ্ডুতে একটা মন্দিরে উঠতে গেলে সাড়ে পাঁচশো সিঁড়ি ভাঙতে হয়, আর এই সামান্য আটতলায় উঠতে পারবো না।

বিনায়কদার ফ্ল্যাটে বসে চা খেতে খেতে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি, এমন সময় দরজার কাছে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে নির্ভুল ভাবে চাঁদার খাতা।

আমি নীচু গলায় বিনায়কদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আটতলার ওপরেও চাঁদার উৎপাত। আমি ভেবেছিলাম এত উঁচুতে ভিখিরি, মশা মাছি আর চাঁদা থাকবে না!

আমাকে চোখের ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়ে বিনায়কদা বললেন, এরা এখানকারই। ফ্ল্যাটের ছেলেরাই পূজো করছে।

বউদি হাসিমুখে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দিতে হবে ভাই?

ছেলেরা বললো, তিরিশ টাকা।

বউদি বিনয়কদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খুচরো তিরিশ টাকা আছে?

বিনায়কদা বললেন, দ্যাখো, শার্টের পকেটে!

ছেলেরা চাঁদা নিয়ে চলে গেল! আমি স্তম্ভিত। কোনো রকম দরাদরি পর্যন্ত নেই। এক কথায় তিরিশ টাকা চাঁদা, তাও কালী পূজায়! বিনায়কদা বিখ্যাত সাম্যবাদী নাস্তিক, কলেজে কোনো পূজো আর্চায় যোগ দেন নি, তাঁর এই পরিবর্তন!

বিনায়কদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। মুখ নীচু করে বললেন, এখানে সবাই মিলে একটা কিছু ঠিক করলে তাতে আর আপত্তি করা যায় না, বুঝলি! সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো!

আমি বুঝলাম। উনি কম চাঁদা দিলে বা চাঁদা না দিলে সবাই ওকে ভাববে কৃপণ কিংবা গরীব। সেটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো!

পরের মাসে গিয়ে দেখলাম, বিনায়কদার ফ্ল্যাটে টেলিভিসান এসে গেছে। এটাও একটা অবাক কাণ্ড। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত উনি ছিলেন টেলিভিসানের ওপর খড়্গহস্ত। সাহেবদের অনুকরণে ওটিকে বলতেন ইডিয়েট বক্স! তাঁর ঘরে এই জিনিস?

মুখ বেজার করে বিনায়কদা বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে শেষ পর্যন্ত এটা কিনতে হলো। এত ঝামেলা!

—লোন নিয়ে কিনলেন? আপনার নিজের কোনো প্রোগ্রাম ছিল নাকি টেলিভিসানে?

বিনায়কদা বললেন, না, সে জন্য নয়! টেলিভিসানে প্রত্যেক সপ্তাহে দুটো করে সিনেমা দেখায় জানিস তো। তোর বউদি সন্ধেবেলা একা একা থাকে, নীচ তলায় ফ্ল্যাটে টেলিভিসান দেখতে যেত, শুধু শনি আর রবিবার।কিন্তু ওরা অভদ্র, গত রবিবার ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, একবার বলেও যায় নি?

আমি বললাম, তা হলে অন্য কোনো ফ্ল্যাটে গেলেও তো হতো—আরো তো অনেকের টেলিভিসান সেট আছে নিশ্চয়ই।

তা আছে। গিয়েও ছিল—তা সেই ভদ্রমহিলা টেলিভিসান সেট চালালেন না, তাঁর ছেলেরা পড়াশুনা নষ্ট হবে। তোর বউদি তো অপমানে মুখ লাল করে উঠে এসেছিল! আসলে তো কারুর আত্মীয়তা নেই, কেউ কারুর সুখদুঃখের সাথী হবে না।সকলকেই সমান সমান হয়ে থাকতে হবে। যাতে কেউ কারুকে ছোট না করতে পারে, বুঝলি?

আমি পুরো বুঝলাম না অবশ্য। এই সব প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলিতেদ কি এসে গেছে সমাজতন্ত্র? সকলেই এখানে সমান, না সমান হবার প্রতিযোগিতা? জানি না, ভবিষ্যতে এর সামাজিক রূপ কী হবে!

পনর

বেনারসে একবার এক সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন সবেমাত্র সাহেবরা জাত খোয়াতে শুরু করেছে। পরাধীন ভারতে যাদের জন্ম, তারা যেসব সাহেব দেখেছে, তাদের সঙ্গে এইসব সাহেবের কোনো মিলই নেই। তখন সাহেবরা ছিল আসল সাহেব, নিখুঁত স্যুট-টাই-পরা,

গ্যাটম্যাট করে ইংরেজি বলতো, আমাদের মতন নেটিভদের মনে করতো মানুষের চেয়ে কিছু ছোট জাতের প্রাণী। হ্যাঁ, সত্যিকারের ভয় ও ভক্তি হতো। সেইসব সাহেবদের দেখে।

আমি পরাধীন আমলের শিশু। হাতিবাগান বাজারের কাছে এক সাহেব পুলিসের হাতে গলাধাক্কা খাওয়ার পর থেকে ওই জাতটির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা ঘৃণা ও আক্রোশের ভাব ছিল অনেকদিন। দন্তী, নখী ও শৃঙ্গীদের মতন আমি এদেরও পরিহার করে চলতুম। সুতরাং কাশীতে সেই সাহেবটির সঙ্গে আমি সহজে আলাপ করতে চাই নি।

যখনকার কথা বলছি, তখনো আমাদের দেশে হাজারে হাজারে হিপি-হিপিনীদের আবির্ভাব শুরু হয় নি। এখন সাহেবরা আমাদের চোখে জলভাত হয়ে গেছে। নোংরা পোশাক, খালি পা, জটলা চুল মাথার সাহেব মেম দেখলে এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু তখন রাস্তায় বিস্মিত লোকের ভিড় জমে যেত।

ঐ সাহেবটি এবং তার বন্ধুবান্ধবরা ছিল হিপিদের পূর্বসূরী। এদের নাম ছিল বীট, কেউ বলতো বীটনিক, এদের উদ্ভব আমেরিকায়।এরা সকলেই কবি বা ঔপন্যাসিক বা শিল্পী বা ধর্মপিপাসু।বুদ্ধদেব বসু প্রথম এদের সম্পর্কে বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন। ইংলণ্ডে এর কিছু আগে শুরু হয়েছে অ্যাংরি ইয়ংমেনদের যুগ। এরা হিপিদের মতন নিছক ছন্নছাড়া নয়, তখনো ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হয় নি বলে নিছক নামকাটা সেপাইরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে নি। বীটরা চাইতো শুধু শিল্প সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে, তাই অন্য কোনো কাজকর্মে তারা বিশ্বাসী ছিল না, জীবন কাটাতো খুব সরলভাবে ও কম খরচে।

বেনারসে প্রথম এই সাহেবটিকে দেখে আমিও চমকে উঠেছিলাম। একটা সাদা নোংরা পাজামা, তার ওপর টকটকে লাল রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের চটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথাভর্তি বাবরি চুল, গালে বিশাল গোঁফদাড়ির জঙ্গল।অনেক দিন রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে রংটা পোড়া পোড়া, প্রথমে সাহেব বলে চেনা যায় না, আবার একটু পরেই চেনা যায়, কারণ জলের মধ্যে তেলের মতন সাহেবরা অন্য মানুষের মধ্যে কিছুতেই লুকোতে পারে না।

আমি মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে ঘুরছিলাম, সাহেবটি সরাসরি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সংস্কৃত জানো?

আমি একটু থমোমতো খেয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সাহেবরা বিনা পরিচয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলে না, শুধু ধমক বা গালাগালি দেওয়া ছাড়া। তা ছাড়া আমেরিকানদের ভাষাও আমি চট করে বুঝতে পারি না।

সুতরাং একটু থেমে, আগে মনে মনে বাক্যটা তৈরি করে নিয়ে, তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি কী বললেন?

—তুমি সংস্কৃত জানো?

—হ্যাঁ জানি!

উত্তর দিয়ে আমি মনে মনে জিব কাটলাম! সংস্কৃত? স্কুলে পড়ার সময় আমি বারবারসংস্কৃত পরীক্ষার দিন নাকের জলে চোখের জলে এক হয়েছি। শব্দরূপ মুখস্থ করতে গেলেই মনে হতো কে যেন আমার মাথায় হাতুড়ি মারছে! সেই আমি এ কি বললাম? সংস্কৃতের ব্যাপারে সাহেবদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ সাহেবরাই আমাদের দেশে নতুন করে সংস্কৃতের চর্চা শুরু করে গেছে। এ যদি এখন আমার পরীক্ষা নেয়? সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলির মন্ত্রটুকু ছাড়া আর তো কিছুই আমার মুখস্থ নেই!

সাহেবটি একটি সাধুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, তুমি ওঁকে আমার দু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে?

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলালাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ছাড়া, আমি আর কোনো সাধুকে কখনো সংস্কৃতে কথা বলতে শুনি নি। ভাঙা হিন্দীতে দিব্যি কাজ চলে যায়। উৎসাহের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই পারবো।

সাধুটির চেহারা একেবারে বাঘের মতন। বাঘের সঙ্গে ঠিক কোন জায়গায় মিল তা আমি বলতে পারবো না, তবে তাকে দেখলে ঐ কথাই মনে হয়। জল-কাদার ওপর জোড়াসনে ঋজুভাবে বসে আছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তরুণ বয়স্ক দারুণ সবল চেহারা, শরীর একছিটে মেদ নেই, চোখদুটি খোলা এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। সাহেবটির সঙ্গে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সাহেবটি বললো, তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, আমি জানতে চাই, এই যে উনি শীতের মধ্যে খালি গায়ে জল কাদার মধ্যে বসে আছেন, তা কেন, কিসের জন্য? মানুষ কি করে নিজের চেতনার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে?

আমি সাধুটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললাম, বাবা, এই সাহেব অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে, আপনার কাছ থেকে দু একটা কথা জানতে চায়। আপনি দয়া করে একটু শুনবেন কি?

সাধুটি কোনো উত্তর না দিয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকালো।

সাহেবটি ভাবলো, আমি বুঝি তার কথাই সাধুটিকে জিজ্ঞেস করেছি। সে আবার বললো, তুমি ওঁকে বলো, আমি একটি শিশু যেমন বাবার হাত ধরে অচেনা জায়গায় যায়, সেই রকম আমিও ওঁর নির্দেশ নিয়ে চেতনার সীমানা ছাড়ানো সেই রহস্যময় গহনলোকে যেতে চাই!

আমি এবার সাহেবটিকেই আগে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এরকম কথা চট করে শোনা যায় না তো। তার ব্যবহারে কোনো হালকা ভাব নেই। বরং তার চোখে মুখে একটা উঁচু জাতের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সাহেবটি সাধারণ নয়।

সাধুটিকে আবার বললাম, বাবা, ইনি জানতে চাইছেন...

সাধু জলে হাত ডুবিয়ে কাদার পরে একটা গোল চিহ্ন আঁকলো। তারপর তার চারপাশে আরও কয়েকটি দাগ কাটতে লাগলো। হতে পারে এটা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা, কিন্তু এর মানে বোঝা আমার সাধ্য নয়।

সাধুটিকে খুশী করবার জন্য আমি তার পা ছুঁতে যেতেই সে দড়াম করে আমাকে এক লাথি কষালো। সাধু সন্ন্যাসীদের এরকম ব্যবহার দেখলে লোকের আরও ভক্তি বাড়ে! আমার রাগ হলো। উল্টে আমিও একটা লাথি ঝাড়বো কিনা ভাবছিলাম তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা কথা মনে পড়লো। সাধুটি আসলে মৌনী আমরা শুধু শুধু ওকে বিরক্ত করছি। সংস্কৃত বা হিন্দী কোনো ভাষাতে ওকে কথা বলানো যাবে না, অন্তত আজ!

সাহেবটিকে সেই কথা বলতেই সে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমা চাইল। লজ্জিত ও অনুতপ্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাঁটতে লাগলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। একটু বাদে সে তার কাঁদে ঝোলানো চেটের থলে তেকে দুটো কলা বার করলো। আমাকে দিয়ে বললো, খাও।

আমার পূর্ব পুরুষদের মতন কলা সম্পর্কে আমার কোনো আসক্তি নেই। ফলে পাকড়ই আমি পছন্দ করি না। তবু প্রত্যাখান করতে পারলাম না। এত অল্প চেনা লোককে কেই ফট করে একটা কলা খেতে দেয় না।

কোসা ছাড়িয়ে কলার একটা কামড় বসিয়ে সে বললো, অপূর্ব! অতীব মহৎ বস্তু!

সত্যিই সেই বর্তমান কলা, ঠিকঠিক পাকা, খুবই সুস্বাদু ছিল। সাহেবটি বললো, ঈশ্বর একজন ভালো পাচক।

একটু থেমে সে আবার বললো, না ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ পাচক। তা না?

সেই থেকে সাহেবটির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম অ্যালেন। আর এক বন্ধুর সঙ্গে সে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। তারা দুজনেই কবি। আমি মাঝে মাঝে যেতাম ওদের ঘরে। একটা জিনিস দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, কত রকম উপকরণে ওরা জীবন কাটাতে পারে। খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক নেই, যখন খিদে পায়, বেরিয়ে গিয়ে কিছু ফলটল বা দুচারখানা হাতে গড়া রুটি কিনে নেয়। দুটি মাত্র কম্বল ছাড়া ওদের শয্যা বলতেও আর কিছু নেই। নানান বইতে পড়েছি, চিত্রশিল্পীরা দেশ-বিদেশের নানান জায়গায় গিয়ে বহু রকমের জীবন কাটিয়েছে কিন্তু

কবিদেরও যে সে রকম জীবন কাটাবার দরকার থাকতে পারে, তা ওদের দেখে বুঝলাম। তখন আমাদের দেশের কবিদের এই সুযোগের অভাবের কথা ভেবে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে।

অ্যালেনের আগ্রহ ঠিক ঈশ্বরে বা ধর্ম সম্পর্কে নয়। বরং ধ্যান বা সাধনায় মানুষের চেতনার আরও বিস্তার হতে পারো কিনা, তাই ও জানতে চায়। ও চায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আরও সূক্ষ্মতর করতে। এটা কবির যোগ্য অনুসন্ধান নিশ্চিত।

যাই হোক, এই রচনাটি শুধু ঐ অ্যালেনের পরিচয় দেবার জন্যই নয়। রচনাটির নাম হওয়া উচিত, সাহেব ও শিবুর মা। শিবুর মা সম্পর্কে একটু পরেই বলছি।

অ্যালেনের সঙ্গে আমার পরে আরও অনেক জায়গায় অনেকবার দেখা হয়েছে। ও দেশে ফিরে গিয়ে আবার হঠাৎ চলো এসেছে। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওর বাড়িতে থেকেছি। চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, কলকাতায় বসে হঠাৎ ওর টেলিফোন পেয়েছি, ইত্যাদি।

সেই রকমই অ্যালেন একবার হঠাৎ কলকাতায় এসেছে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারে ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে জিনিসপত্র রেখে তারপর সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এসেছে আমাকে খুঁজতে।

সন্ধেবেলায় আমি কি করে বাড়িতে থাকবো? তাহলে তো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই উল্টে যায়। সেই সন্ধেবেলা আবার আমাদের বাড়িতে আর কেউই ছিল না। শিবুর মা ছাড়া।

শিবুর মা আমাদের বাড়ির রাঁধুনি। বয়সে হয়েছে অনেক এবং বিশ্ব সংসারে তার কেউ নেই। এমন কি শিবুর মা নামটা এখনো থেকে গেলেও তার শিবু মরে হেজে গেছে বহুদিন। শিবুর মা বিধবা হয়েছে মাত্র আঠারো বৎসর বয়েসে, তারপর এতগুলো বছর ধরে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়েছে কিন্তু কোনোরকম তিক্ততা নেই। সব সময় হাসিখুশী মুখ, আমাদের পাড়ার সবাই শিবুর মাকে ভালোবাসে।

শিবুর মায়ের বাড়ি সুন্দরবনের কাছাকাছি, সেখানে তার দুতিনটি পালিত পুত্র-কন্যা আছে। তার মাইনের টাকা সেখানেই পাঠায়। আমরা কতবার সৎ উপদেশ দিয়েছি,টাকাগুলো তার অথর্ব দশার জন্য জমাতে, কিন্তু সে তা শোনো না। হাসিমুখে বলে, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই!

শিবুর মা তার স্বামীর মৃত্যুটাও ভাগ্য হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। তার স্বামীর পেশা ছিল সুন্দরবন থেকে মধু এনে বিক্রি করা। এ জন্য লাইসেন্স লাগে, কিন্তু শিবুর বাবার লইসেন্স ছিল না, লুকিয়ে চুরিয়েই কাজটা চালাতো। এর ফলে একদিন বাঘের পেটে প্রাণ হারানোই ছিল তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক নিয়তি। কিন্তু সে মরেছিল গুলি খেয়ে। বনবিভাগের সাহেবরা এসেছিল একটা গুণ্ডা বাঘ মারতে, এক আনাড়ি সাহেবের বন্দুক থেকে উল্টোদিকে গুলি ছুটে গিয়ে শিবুর বাবার পেট ফুটো করে দেয়। ঘরে আঠারো বছরের যুবতী বউ ও একটি তিন বছরের শিশু রেখে সে জঙ্গলের মধ্যে চিৎপাত হয়ে মরে পড়ে থাকে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আর কাকে বলে! যে সাহেবের বন্দুক থেকে গুলি ছুটেছিল, সে ছিল একজন খাঁটি গোরা। কিন্তু তার কোনো শাস্তি হয় নি আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায়। এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় শিবুর মা চোখ বড় বড় করে আমাদের বলেছে, শিবুর বাপের যে লাইসেন ছিলনি, মা! লাইসেন না নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, তাই সাহেবরা বললো, আমরা কি জানি! কেন সে এয়েছিল, আগে তার হিসেব দাখিল করো!

যেন প্রকৃতির জঙ্গলে জীবিকা অর্জনের জন্য গিয়ে শিবুর বাবা মস্ত এক অপরাধ করে ফেলেছিল। এই জন্য যে শিবু এবং শিবুর মাকেও মেরে ফেলা হয় নি, এটাই তো মস্ত বড় ভাগ্যের কথা! অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন বিভাগ থেকে দয়াবশত চৌদ্দ শো টাকা দেওয়া হয়েছিল শিবুর মাকে। এই কাহিনীর এই অংশটা আমি কখনো বুঝতে পারি নি। ঠিক কোন হিসেবে, কোন বিশেষ কায়দায় যে একটা লোকের জীবনের দাম ঠিক চৌদ্দ শো টাকা নির্দিষ্ট করা হয়, তা বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য।

স্বামীর হত্যাকারীকে তো নয়ই, জীবনে কোনো সাহেবকেই শিবুর মা দেখে নি সামনা-সামনি। দেখলো সেদিন সন্ধেবেলা।

বাড়িতে আর কেউ না থাকলে শিবুর মা অতিথিদের দরজা খোলে না। খুব সাবধানে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলে দেয়, নেই কেউ!

অ্যালেনের গায়ে সেদিন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, গলায় সেই রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি দেখে ভেবেছে কোনো সাধু সন্ন্যাসী। সিঁড়ির আবছা আলোয় তাকে সাহেব বলে চিনতে পারে নি। দু'জনে কেউ কারুর কথা বোঝে না। শেষ পর্যন্ত অ্যালেন হাতের ইশারায় জানিয়েছে যে সে একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাবে।

অনেক চিন্তা করে দরজা খুলে দিয়েছে শিবুর মা। সাধু যখন, তখন ভয় নেই। অ্যালেন হয়তো শিবুর মাকে ভেবেছে আমার মা, কিংবা রাঁধুনি হিসেবে বুঝতে পারলেও কিছু আসে যায় না৷সব মানুষকে সে সমান শ্রদ্ধা করে। দরজা খোলার পর সে সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় শিবুর মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছে, মাই রিগার্ডস ম্যাম! কোনো সাধু প্রণাম করতে আসছে দেখে শিবুর মা ধড়ফড় করে তাকে বাধা দিতে গেছে, তখন বুঝেছে, শুধু সাধু নয়, সাহেব!

আমরা রাত্তিবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি, দরজা খোলা, আর সামনেই মাটিতে বসে আছে শিবুর মা, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

কী হয়েছে, কী হয়েছে শিবুর মা? আমাদের বারবার প্রশ্নেও সে কোনো উত্তর দেয় না। যেন তার ঘোর-লাগা অবস্থা। তারপর এক সময় সে ডুকরে বলে উঠলো, ওগো সে এয়েছিল, একজন সাহেব, ঠিক সাধুর মতন, কত তার মায়া...

তারপর শিবুর মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কাঁদছো কেন? সাহেব এয়েছিল বলে কাঁদছো কেন শিবুর মা? আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলাম।

৷সে আমার পায়ে ধরেছিল! সে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল, সে বলেছিল, আমি এসেছি, মা! সে বোধহয় তার ছেলে, আমার রান্না দেখে সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল—ওগো আমি কোথায় যাবো, এত সুখ আমার ভাগ্যে ছিল.....

আমরা নির্বাক হয়ে রইলাম। অ্যালেন কোনোদিন জানতেও পারবে না সে সামান্য একটু সৌজন্যে শিবুর মায়ের দুঃখী জীবন কতখানি ধন্য করে দিয়ে গেছে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে, শিবুর মায়ের স্বামীহন্তার জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

ষোল

পৃথিবীর মানুষকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, যারা কুকুর ভালোবাসে। এবং যারা ভালোবাসে না। আমি নিজে ঐ দ্বিতীয় দলে পড়ি!

আমি কুকুর ভালোবাসতে পারি নি। অনেক চেষ্টা করেও। সেই কারণেই বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের' ধরাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে, ভালোবাসতে না পারলেও ঐ প্রাণীটিকে আমি ভয়, ভক্তি ও সমীহ করে থাকি, যতটা করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়েও কুকুর প্রেমিকদের প্রেম অনেক বেশী তীব্র হয়। সারা দিনরাত কুকুরই ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়ে! লাই পেতে পেতে কুকুর যে একদিন মনিবেরই মাথায় চড়ে বসে, এ দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। লোকে প্রথম কুকুর পুষতে চায় নিরাপত্তার কথা ভেবে, কুকুর বাড়ি পাহারা দেবে, চোর-ডাকাত এলে সজাগ করবে। কিন্তু কিছুদিন পরই ব্যাপারটা বদলে যায়৷কুকুর কী খাবে, তার মনে শান্তি আছে কিনা, তার গায়ে চুলকুনি হলো কিনা, কার্তিক মাসে কী করে তার প্রেমিকা সংগ্রহ করা হবে৷এই চিন্তাতেই বাড়ির লোক ব্যতিব্যস্ত। অধিকাংশ কুকুরই চিঠির পিওন, নিরীহ আত্মীয় বা বস্তা-কাঁধে শিশি বোতলওয়ালাকে দেখলেই দারুণ ডাকাডাকি শুরু করে৷কিন্তু চোর এলে ঘুমিয়ে থাকে।

আমার এক বন্ধু গত পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কলকাতার বাইরে যায় নি। কারণ, সে না থাকলে তার অতি প্রিয় কুকুরটিকে কে খেতে দেবে? অন্য কারুর উপর বিশ্বাস করে সে কুকুরের

ভার দিতে পারে না। যদিও সে কুকুরটি পুষেছিল তার বাড়ি পাহারা দেবার জন্য, এখন সে নিজেই কুকুরটিকে পাহারা দেয়। প্রতিদিন মাংস খেয়ে খেয়ে কুকুরটা ইয়া কেঁদো চেহারা হয়েছে!

ছোট্ট ফুরফুরে বা লোমশ তুলতুলে কুকুর সম্পর্কে তেমন কোনো বিরূপতা নেই আমার, কিন্তু যে বাড়িতে বড় কুকুর থাকে, সে রকম কত বাড়ির সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে আমাকে! কুকুরওয়ালা কোনো বাড়িতে মেয়েদের দিকে দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখিনি পর্যন্ত! শিকল-বাঁধা কুকুরের হিংস্র চিৎকারও আমার কানে পীড়া দেয়। বাড়ির মধ্যে অতবড় একটা জন্তুকে দেখলেই আমার গা শিরশির করে! অনেক বাড়িতে কিছুই না জেনে বসবার ঘরে সবেমাত্র চা-টা খেতে শুরু করেছি, এমন সময় কোথা থেকে একটা নেকড়ের বংশধর ছুটে এসে গায়ের গন্ধ শুকতে শুরু করে কিংবা দুটো থাবা তুলে ধরে পিঠের ওপর। বাড়ির মালিক তখন সহাস্যে বলে, ভয় নেই, কিছু করবে না, কিছু করবে না!

এই কথা শুনে আরও গা জ্বলে যায়। কিছু করবে না মানে কী? কামড়ে আমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে নেওয়া কি কিছু করা? কেনই বা সে আমার গায়ের গন্ধ শুঁকবে, কেনই সে লালভরা জিভ দিয়ে আমার পা চাটবে, কেনই বা আমার পিঠে থাবা তুলে দাঁড়াবে? একটা অচেনা লোককে আমার গা ছুঁতে দিই না, একটা কুকুর এসে কেন ছোঁবে!

কুকুরের মালিক এর পরেও বলে, ও খুব ভালো, দেখবেন কী রকম কথা শোনে! গোল্ডি, গোল্ডি, কাম হিয়ার!

কুকুরের এই ইংরেজি ভাষা-প্রীতিরও কোনো অর্থ আমি বুঝি না।

শাস্ত্র অনুসারে নখী মৃঙ্গী, দন্তী এবং বাজীদের থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করলেও আমার কপালেই এক সময় দারুণ দুর্ভোগ জুটে যায়!

এক বন্ধুর সুপারিশে আমি একবার একটা টিউশানি করতে গিয়েছিলাম। তখন কাঠ বেকার, পাড়ায় চায়ের দোকানে ধারই জমে গেছে তেষট্টি টাকা, আর সিগারেটের দোকান ধার দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সময় একশো টাকার একটা টিউশানি পাওয়া মানে তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার সমান। নির্দিষ্ট দিনে কনফিল্ড রোডের সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বাড়িটি একটু বিচিত্র। এক বিধবা মহিলা তাঁর তিনটি মেয়েকে নিয়ে থাকেন, বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। ওঁদের অবস্থা খুবই সচ্ছল, জীবনযাত্রা খুবই সাহেবী ধরনের, বাড়িখানাও ইংরেজ-পছন্দ। ভদ্রমহিলা চমৎকার বাংলা জানলেও মেয়েরা সব সময় ইংরিজিতে কথা বলে, তাদের শিক্ষাও আগাগোড়া ইংরিজিতেই। কিন্তু সেই সময় সবে মাত্র একটা বিচ্ছিরি নিয়ম হয়েছে যে সিনিয়র কেম্ব্রিজেও বাঙালীদের বাংলায় একটা পেপার পাস করতেই হবে। আমার কাজ সেই বাংলা শেখানো। ব্যাপারটা আমার পক্ষে সব দিক থেকেই সুখের, সুতরাং তক্ষুনি রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা কুকুর ঢুকলো। প্রায় সিংহের মতন আকৃতি, চোখ দুটি ভাঁটার মতন। আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম, এ বাড়িতে আর কোনো দিন আসছি না। মাথায় থাক একশো টাকা! এখন কোনোক্রমে ভালোয় ভালোয় বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে হয়। এমন রোগা হয়ে বসে রইলাম যাতে একটু বাদে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি!

ভদ্রমহিলা বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝলেন। কুকুরটির গলা ধরে টেনে রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি কুকুরকে ভয় পান?

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে খাঁটি কাপুরুষের মতন ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি তো সন্ধেবেলা আসবেন, এসে সিঁড়ির নিচে থেকে ডাকবেন, আমরা কুকুরটাকে বেঁধে রাখবো, ছাদের ঘরে রাখবো, আপনার কাছে কক্ষনো আসবে না।

সেই ব্যবস্থাই হলো। আমি সিঁড়ির তলায় এসে একবার মাত্র ওদের কারুর নাম করে ধরে ডাকলেই কুকুরটা ঘাউ ঘাউ করে ওঠে, তখন ওদের কেউ এসে কুকুরটাকে শেকল বেধে নিয়ে যায়।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সতর্কভাবে চারদিক দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠি। কুকুর যেমন মানুষের গন্ধ পায়, আমিও তেমনি কুকুরটি গন্ধ নেবার চেষ্টা করি।

তিন চারদিন পর বুঝতে পারলাম, ঐ কুকুরটিই ঐ বাড়ির অভিভাবক। বিধবা মহিলার তিনটি মেয়েই বেশ সুন্দরী।তবু পাড়ার রসিক ছোকরা বা ছিঁচড়ে চোরেরা ঐ কুকুরের ভয়ে ঐ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস করে না।

বাড়িটিতে ছ'সাতখানা ঘর। এর মধ্যে তিনটির বেশী ঘরের কোনো ব্যবহার নেই। দোতলায় সিঁড়ির ঠিক সামনের সাদা টালি বসানো চমৎকার বড় ঘরটি ঐ কুকুরটির নিজস্ব। মাঝে মাঝে সেই ঘরটির দিকে তাকিয়ে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

তিন চার মাস বেশ ভালোভাবেই কাটলো। আমার সন্ধেবেলা এই চাকরিটি ক্রমশই বেশী সুখের হয়ে উঠতে লাগলো। মেয়ে তিনটির ব্যবহার চমৎকার, তাদের সবচেয়ে ভালো গুণ এই যে, আমি ঘন ঘন ডুব মারলেও তারা কোনো রকম আপত্তি জানায় না। নিছক পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া তাদের বাংলা শেখার আর কোনো আগ্রহই নেই, সুতরাং বাংলার শিক্ষক সম্পর্কেও তারা উদাসীন। আমি আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারে প্রায়ই নতুন নতুন গল্প বানিয়ে শোনাই, তারাও সহজেই বিশ্বাস করে নেয়।

সেবার গ্রীষ্মের ঠিক শুরুতেই কুকুরটি পাগল হয়ে গেল। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। কুকুরটি ঐ বাড়ির মহিলা আর তিন মেয়ের খুবই অনুরক্ত ছিল, একদিন দুপুরে তাকে খাবার দিতে যাবার সময় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি মেয়েকে কামড়ে দেয়। অন্যদেরও তাড়া করে আসে। অতি কষ্টে তাকে দোতলায় সিঁড়ির সামনের ঘরটায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এমন জোরে ডাকছে যে সারা বাড়ি কেঁপে উঠছে সেই ডাকে। সন্ধেবেলা গিয়ে ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি হতভম্ব।

মেয়েটিকে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, সে ভালোই আছে। কিন্তু কুকুরটিকে নিয়ে এখন কী করা হবে? তিনটি মেয়েই জোর দিয়ে বলতে লাগলো, তারা কুকুরটিকে কোথাও নিয়ে যেতে দেবে না! তারা কুকুরটিকে এত ভালোবাসে যে তাকে চোখের আড়াল করতে পারবে না? ভদ্রমহিলা ব্যাকুলভাবে বার বার বলতে লাগলেন, কী করা যায় বলুন তো?

আমি আর এর কী উত্তর দেবো? কুকুর সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। মনে মনে অবশ্য ইচ্ছে হচ্ছিল, কুকুরটাকে তো এবার মেরে ফেললেই হয়?

এরপর কয়েকজন বিখ্যাত পশু চিকিৎসককে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন যে কুকুরটি চিকিৎসার অতীত। এইসব ক্ষেত্রে এ কুকুরকে মেরে ফেলাই নিয়ম। কিন্তু তা হলো না, কুকুরটি ঐ ঘরেই বন্দী অবস্থায় রয়ে গেল। তার গর্জন শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, তার চোখ দেখলে শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঐ ঘরের জানলার পাশ দিয়ে আসবার সময় আমি দম বন্ধ করে চোখ বুজে কোনোক্রমে পার হই। যদিও জানি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। কুকুরটা মাঝে মাঝে দরজার ওপর এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে দরজাটা ভেঙে পড়তে পারে।

ভদ্রমহিলা এবং তাঁর তিন মেয়ে এখন আর জানলার কাছে যান না বটে কিন্তু এখনো দূরে থেকে কুকুরটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তাঁদের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে স্নেহ মমতা ভালোবাসা। কিন্তু কুকুরটি এখন ইংরিজি ভাষা একদম ভুলে গেছে, সে হিংস্র দাঁত দেখিয়ে জানলার কাছে তাড়া করে আছে। তাকে মাংস দেওয়া হয় জানলাম বাইরে থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে, একটা লোহার পাইপ ফিট করা হয়েছে, মাঝে মাঝে সেটা দিয়ে তাড়ে জল ছাড়া হয় ঘরের মধ্যে।

কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলা দিন দিন বিমর্ষ আর রোগা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অসাধারণ মনের জোরে, অসময়ে বিধবা হয়েও তিনি একা বিষয় সম্পত্তি সব দেখাশুনো করেন, মেয়েদের শিক্ষা দেবার সব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ ভেঙে পড়েছেন। ওঁর বাড়িতে ঝি-চাকর টেঁকে না। ঐ কুকুরের জন্যই। মাংস ছুঁড়ে দিতে গিয়ে একদিন একটি দাসী নাকি কুকুরটার

মুখে প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছিল। তার পর থেকে তার হিস্টিরিয়ার মতন হয়ে যায়।

উনি আমাকে দুঃখ করে বললেন, দেখুন তো, সবাই বলছে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে। আমার নিজের কোনো ছেলে মেয়ে যদি পাগল হতো, তাকে কী আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারতাম? আমার সব সময় ভয় হয়, নতুন চাকর-বাকররা যদি লুকিয়ে ওর খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়!

এর পর একদিন এলো সেইচরম ক্ষণটি। সেদিন ও বাড়ির দুটি মেয়ে গেছে সিনেমায় তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে। ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে শুধু তার মায়ের কাছে। আমি গিয়ে যখন পৌছেলাম, তখন ওঁরা চা খাচ্ছিলেন। মস্তবড় হল ঘরটার একদিকে বসবার জায়গা, আর একদিকে খাবার টেবিল। ভদ্রমহিলা আমাকে ডেকে বললেন, আসুন, চা খাবেন আসুন।

চায়ের টেবিলে বসে নানা রকম গল্প হতে লাগলো। কুকুরটা মাঝে মাঝে বিকট জোরে ডেকে উঠছে, আর লাফিয়ে পড়ছে দরজার ওপর। এ শব্দ আমাদের কান-সহা হয়ে গেছে, বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি না।

এক সময় বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে তাকালাম। দরজা দিয়ে কুকুরটা ঢুকছে। ওর ঘরের দরজা ভেঙে গেছে।

যেন চোখের সামনে দেখলাম মৃত্যুকে। আর কোনো উপায় নেই। প্রথমেই নিশ্চয়ই আমাকেই খাবে—কারণ পুরুষদের ওপরে কুকুরদের বেশী রাগ থাকে নিশ্চিত। একবার ভাবলাম টেবিলেন ওপর উঠে দাঁড়াবো।কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, অতবড় কুকুর একলাফে এসে ধরে ফেলবে।

ছোট মেয়েটি পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করে উঠে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালো। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা অস্ত্র খুঁজলাম, কিছুই নেই। একটা চেয়ার তুলে মারতে যাবো? অতবড় কুকুরকে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেও কাবু করা যাবে না, তা ছাড়া একবার ফসকালে আর নিস্তার নেই। আমি টেবিলে উল্টো দিকে দাঁড়ালুম।

কুকুরটা কিন্তু ছুটে এলো না, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, লেজটা নাড়ছে, চাপা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ভদ্রমহিলাই শুধু পালাবার চেষ্টা করলেন না, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু গম্ভীর ভাবে বললেন, গোল্ডি গোল্ডি গো ব্যাক টু ইয়োর রুম!

কুকুরটা থমকে দাঁড়ালো। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করলো।

ভদ্রমহিলা দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার সেই কথা বললেন। কুকুরটা কিন্তু ফিরে গেল না। সেও এগিয়ে আসতে লাগলো মহিলার দিকে। আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দুমদুম শব্দ হচ্ছে, সর্বনাশ আটকাবার জন্য কোনো রকম উপস্থিত বুদ্ধিই বার করতে পারলাম না।

কুকুরটা যখন ভদ্রমহিলার কাছে এসে পৌছে গেছে, তখনও তিনি তাকে ফিরে যাবার জন্য হুকুম করছেন, প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপছে। কুকুরটা এবার মুখ দিয়ে একটা করুণ শব্দ বার করলো, অবিকল কান্নার মতন, তারপর থুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। আর নড়লো না। কুকুরটা মরে গেছে!

তাকে কেউ বিষ খাইয়েছে কিংবা সেটাই তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় তা জানা যায় নি, কিন্তু কুকুরটা মরীয়া হয়ে তার শেষ নিশ্বাস ফেলতে এসেছিল সেই মাহিলার কাছে। তিনি যখন টের পেলেন যে কুকুরটা সত্যেই মরে গেছ, তখন বিহ্বল ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তাপরপর হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। সে কি অসম্ভব গভীর কান্না, একেবারে বুকের অনেক ভেতর থেকে উঠে আসছে, তিনি যেন শারীরিক কষ্ট পাচ্ছেন—কান্নার মধ্যে আঃ আঃ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগলো।

ছোট মেয়েটি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

শেষ মুহূর্তে কুকুরটা কি সুস্থ হয়ে উঠেছিল? ফিরে এসেছিল তার স্মৃতি? কি জানি! তবে আমার মনে হলো, কুকুরটা জীবনটা ধন্য, কারণ সে অতখানি ভালোবাসা পেয়েছে! ক'জন মানুষ এতটা ভালোবাসা পায়?

সতের

বাসটা হর্ন দিতে দিতে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, ডান দিকে তাকিয়ে চোখে পড়লো, একটা মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। সকলেরই এক রঙের পোশাক, হালকা নীল রঙের ফ্রক বা শাড়ি পরা কয়েক শো মেয়ে হুড়ো হুড়ি করে বেরিয়ে আসছে স্কুলের গেট দিয়ে, তাদের রিনরিনে গলার আওয়াজে আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে। অনেকদিন আগে এই রকম নীল। সেই ঝরণা দেখার মতনই আমি এই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখটা সুস্নিগ্ধ লাগে।

আমাদের বাসটা আটকে গেছে, কারণ মেয়ে স্কুলটার সামনে এখন অনেক গাড়ি আর রিক্শা। ওদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। বাসেও উঠছে অনেকে। আমি রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটি ফ্রক পরা মেয়ের দিকে চোখ আটকে গেল। স্কুলের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সাদা টিনের বইপত্রের বাক্স। দু'হাত দিয়ে ধরে আছে বাক্সটা, মুখখানা খুব ক্লান্ত, চোখ দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

আমি প্রথমে একটু চমকে উঠলাম। ঝুমা না? হ্যাঁ, ঝুমাই তো। বেশ বড় হয়ে গেছে। পাঁচ ছ'বছরের দেখেছিলাম, এখন প্রায় দশ এগারো বছর বয়েস। তা তো হবেই অনেকদিন কেটে গেল।

আজ ঝুমাকে কে নিতে আসবে? ঝুমার বাবা না মা? আজ কী বার?

আজ শনিবার। আজ বোধ হয় পঙ্কজেরই আসার কথা। রাস্কেলটা যেন দেরি না করে? ঝুমার জন্য আমার একটু একটু দুঃখ হলো। যদিও আমার দুঃখ করার কোনো কারণই নেই, এটা এক ধরনের বিলাসিতা, এই হঠাৎ হঠাৎ দুঃখ বোধ করা।

বাস ছেড়ে দিয়েছে, আমি আর ঝুমাকে দেখতে পেলাম না।

পঙ্কজদের অফিসে পাঁচদিনে সপ্তাহ। শনিবার ওর পুরোই ছুটি, মেয়েটাকে স্কুলের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা ওর কোনোক্রমেই উচিত নয়। যদি পঙ্কজ ভুলে যায়? একদমই না আসে? পঙ্কজটার তো দায়িত্বজ্ঞান বেশী নয়—তা হলে কী হবে? না, এসব আমার ভাবার কী দরকার!

চিত্রলেখার আজ এদিকে আসবার কথা নয়। কিন্তু সে এসে দূর থেকেও কী লক্ষ্য করবে না যে ঝুমা তার বাবার সঙ্গে ঠিকঠাক গেলে কি না গেল?

পঙ্কজ আর চিত্রলেখার বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলাম। তখন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে দেবার মতন তিরিশ চল্লিশটা টাকা জোগাড় করারই সামর্থ্য ছিল না পঙ্কজের। তবু সে সব দিন কত আনন্দ, কত উত্তেজনার। আমরা বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু টাকা তুলেছিলাম, তাইতেই রেজিস্ট্রির খরচ, দুটো ফুলের মালা আর সকলের জন্য একটা করে মোগলাই পরোটা হয়ে গিয়েছিল। ফুল শয্যা হয়নি। সন্ধেবেলাই চিত্রলেখা ফিরে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে, পঙ্কজ আমাদের আড্ডায় থেকে গিয়েছিল শুকনো মুখে।

চিত্রলেখাদের বাড়ির পূর্ণ সম্মতি থাকলেও পঙ্কজদের বাড়িতে ছিল ঘোর আপত্তি এই বিয়ের ব্যাপারে। কারন পঙ্কজ তখন বেকার কিন্তু বেকারদের কী প্রেম-ভালোবাসা, থাকতে নেই? পঙ্কজ রীতিমতন জোয়ান ছেলে, এম এ পাশ৷ তবু যে সে বেকার রয়েছে সেটা কি তার দোষ? এ দেশে ফ্রিলাভ চালু হয় নি, তাই ওদের বিয়ে করতে হলো। যাই হোক, ওদের বিয়ের ব্যাপারটা দু বাড়িতেই গোপন রাখা হয়েছিল প্রায় এক বছর। তারপর পঙ্কজ হঠাৎ দুম করে পেয়ে গেল একটা বেশ ভালো চাকরি। সেই বছরই ঝুমা জন্মালো।

ঝুমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, চমৎকার ছড়া বলতে শিখেছে আর আমরা গেলেই সে সেধে নাচ দেখায়—সেবারই পঙ্কজ আর চিত্রলেখার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আদালতে উঠলো।

এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার নিগূঢ় সম্পর্ক কী করে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তা বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব না। বাইরে দু'চারটে চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। পঙ্কজের মনটা সত্যি ভালো, মায়া-দয়া আছে, পরোপকারের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানটা একটু কম। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না। টাকা পয়সা সম্পর্কে কোনোরকম হিসেবের ধার ধারে নি কখনো, পকেটে যা আছে তা

উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করে নি কক্ষনো। চিত্রলেখাও বেশ ভালো মেয়ে, কিন্তু বড্ড রাগী। এমনিতে খুব শান্ত, নম্র, বাড়িতে লোকজন এলে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসে।কিন্তু কেউ কোনো কথা দিয়ে না রাখলে তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। কিন্তু এই সব কারণে কি বিচ্ছেদ হয়?

বিয়ের দু'তিন বছরের মধ্যেই চিত্রলেখা আর পঙ্কজের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল, এক সময়ে তা চরমে উঠলো। আমরা প্রথমে কিছুদিন বোঝালাম, তারপর ওদের বাড়িতে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। তবে, যেহেতু পঙ্কজ বা চিত্রলেখা এর মধ্যে অন্য কারুর প্রেমে পড়ে নি, তাই ওদের বিচ্ছেদের কথা আমরা চিন্তাই করি নি! আমরা ভেবেছিলাম, এক-একটা দম্পতি থাকে এরকম ঝগড়াটে, ঝগড়াতেই তারা সুখ পায়।তারা চায় না বাড়িতে কোনো বন্ধুবান্ধব আসুক!

একদিন পঙ্কজ এসে বললো, চিত্রলেখা আমার কাছ থেকে ডির্ভোস চাইছে, আমি রাজি হয়ে গেছি। আমি আর পারছি না।

ওদের মামলা বেশী দূর গড়ায় নি। দু-পক্ষেরই সম্মতি ছিল, তা আইন অনুযায়ী সময় কাটিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পঙ্কজের শুধু একটাই শর্ত ছিল। মেয়েকে সে দারুণ ভালোবাসে। মেয়েকে না দেখে সে থাকতে পারবে না। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন মেয়ে এসে থাকবে তার কাছে।

চিত্রলেখা আগেই চাকরি করতো একটা কলেজে, বিয়ের পরেও সে কাজ ছাড়ে নি, সে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেল। কিন্তু সে আর পঙ্কজের মুখদর্শনও করতে চায় না বলে ব্যবস্থা হয়েছে যে পঙ্কজ প্রতি শনিবার মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে আবার সোমবার স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবে। চিত্রলেখার বাড়িতে তার যাওয়ার দরকার নেই।

অনেকদিন পর ঝুমাকে দেখে আমার মনটা একটু খচখচ করতে লাগলো। প্রাপ্তবয়স্করা তাদের জীবন নিয়ে যা-খুশি ছিনিমিনি খেলতে পারে। কিন্তু একটা শিশুর সুন্দর শৈশবই প্রাপ্য। ঝুমার সেই ক্লান্ত মুখে স্কুলের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা কিছুতেই মন থেকে মোছে না।

অবশ্য, এর থেকে আর ভালো ব্যবস্থা কী-ই বা হতে পারে! ঝুমা তার পিতৃস্নেহ-মাতৃস্নেহ দুই-ই পাচ্ছে। কত ছেলেমেয়েরই তো বাবা থাকে প্রবাসে বা বিদেশে, কিংবা একজায়গায় থাকলেও কাজ এত ব্যস্ত থাকে যে শনি-রবিবার ছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা কথা বলারও সময় পায় না। ঝুমাও তো তার বাবাকে সপ্তাহে দু'দিন পাচ্ছে! অবশ্য মা আর বাবাকে একসঙ্গে পাচ্ছে না। কিন্তু মা আর বাবা এক বাড়িতে থেকে সব সময় ঝগড়া করছে।এ দৃশ্যও বোধহয় কোনো শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত নয়!

ঠিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয় এমনিই সে রবিবার পঙ্কজের বাড়িতে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে দারুণ আড্ডা জমেছে। পঙ্কজের বাবা মারা গেছেন, মেজোভাই নাসিকে চাকরি করে, মা চলে গেছেন সেখানে। বাড়িতে ও এখন একা। চারজন বন্ধু ও দুটি বান্ধবী মিলে প্রচণ্ড শোরগোলের সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে রবিবারের আড্ডা। ডজন দু-এক বীয়ারের বোতল এসেছে। পঙ্কজ আমাকে বললো, কি রে, অনেকদিন তোর পাত্তা নেই কেন?

পঙ্কজের ঘরটা আবার তার ব্যাচিলার জীবনের অবস্থায় ফিরে এসেছে। ঘরভর্তি এলোমেলোভাবে বইপত্তর ছড়ানো। আশট্রেগুলিতে উপচে উঠছে ছাই, খাটের নীচে ময়লা।

এক সময় ঝুমা ঢুকলো ঘরে, হাতে একটা ছবির বই। পঙ্কজ তাকে দেখেই বললো, মামণি, কী হয়েছে?

ঝুমা বললো, কিছু হয় নি।

—তুমি খেয়েছো?

—না। এক্ষুনি কি খাবো?

—ঠিক আছে, সাড়ে বারোটার সময় খেতে বসে যেও কিন্তু! রাঁধুনিমাসীকে বলো, তোমার খাবার দিয়ে দেবে।

ঝুমা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। বড়োদের আড্ডায় ছোটদের থাকাটা ভালো দেখায় না। তখন আমাদের কথাবার্তাও চলছিল রীতিমতন আমিষ বিষয়ে। আমরা চুপ করে গেলাম। পঙ্কজ কিন্তু ঝুমাকে চলে যেতে বললো না। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে এনে, মামণি, আমার মামণিটা, সুন্দর মামণিটা বলে আদর করতে লাগলো।

ঝুমা লজ্জা পেয়ে গেল। সে তো এখন আর তেমন ছোটটি নেই। এত লোকের সামনে বাবার আদর খেতে তার লজ্জা পাবারই কথা। সে শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

আরও যে দুটি মেয়ে বসেছিল, তারাও ঝুমাকে ডেকে নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। তাদেরও কথাবার্তায় যেন মায়া মমতা ঝরে পড়েছে। ঠিক যেমন মা-মরা শিশুর প্রতি অন্যদের করুণা থাকে।

আমার হঠাৎ মনে হলো, চিত্রলেখা এখন কী করছে? ঝুমা কাছে নেই বলে তার কি ফাঁকা লাগছে? শনি-রবিবারগুলো সে কী ভাবে কাটায়?

ঝুমা একটু পরেই এক ছুটে ভেতরে চলে গেল।

তারপর বীয়ারের বোতলগুলো যতই খালি হতে লাগলো, আড্ডা ততই জমে উঠলো। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বলে কারুর আর বড়ি ফেরার তাড়া নেই। ইতিমধ্যে একবার পঙ্কজ ওখানে বসেই হাঁক দিয়েছিল ঝুমা, মামণি, খেয়ে নিয়েছো তো?

দূর থেকেই ঝুমা উত্তর দিয়েছিল, এক্ষুনি খেতে বসছি।

আড়াইটে বাজার পর আমি উঠে পড়লাম। এবার বাড়ি ফিরতেই হবে। একতলার টানা বারান্দার ওপ্যাশে বাথরুম। সেদিকে যেতে গিয়ে ডান দিকে খাবার ঘরটা চোখে পড়ে।

সেদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। খাবার টেবিলে মাথা রেখে ঝুমা ঘুমিয়ে আছে। সামনের থালায় তার ঝোল মাখা ভাত পড়ে আছে অসমাপ্ত মাছের টুকরোটাও রয়ে গেছে। হয়তো তার খেতে আর ভালো লাগে নি। হঠাৎ ঘুম এসে গেছে। কিন্তু খাবার টেবিলে ঐ ঘুমন্ত বাচ্চা মেয়েটির মধ্যে একটা দারুণ একাকীত্বের দৃশ্য আছে। আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো।

পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালাম, এরকম তো হয়ই! ঝুমার এগারো বছর বয়সে, সে তো একা খেয়ে নিতেই পারে! ঝুমার মা যদি সিনেমায় যেত কিংবা কোথাও বেড়াতে, তাহলে ওকে তো একাই খেয়ে নিত হতো। ঘুমিয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ব্যাপার।

কাছে গিয়ে ঝুমার চুলে হাত দিয়ে বললাম, ঝুমা ওঠো!

ঝুমা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ।

আমি আবার নিজেকে বোঝালাম, এরকম তো হয়ই!

আঠার

পাঠানকোটের একটা দোকানে এমন ঝাল মাংস খেয়েছিলাম যে তারপর প্রায় একঘন্টা পর্যন্ত ঠোঁট আর জিভ জ্বলছিল। ওঃ সে কি অসম্ভব আগুনের মতন ঝাল, যেন মশলার বদলে বারুদ দিয়ে রান্না করেছে।

আমি বাজার কাঁচা লঙ্কা কিনতে গেলে একটা ভেঙে জিভে ঠেকিয়ে আগে দেখে নিই, সুতরাং ঝাল দিয়ে আমাকে জব্দ করা শক্ত। তবু জব্দ হয়েছি দু'বার, একবার দক্ষিণ ভারতে বেজোয়াড়া নামের একটি জায়গায় একটা ছোট হোটেলে, সেখানে মাংসের ঝোলে জিভ ঠেকিয়েই আমি প্রায় নাচতে শুরু করেছিলাম।মনে হয়েছিল পেটের নাড়িভুঁড়ি সব জ্বলে গেল! আর দ্বিতীয়বার এই পাঠানকোটে!

ঝাল জিনিসটার একটা মজা এই যে, মাঝপথে থামা যায় না। আরও খেয়েই যেতে হয়। এক টুকরো মাংস মুখে তুলছি আর উঃ আঃ করে চেঁচাচ্ছি, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই অবস্থায় প্লেটটা

চেটেপুটে শেষ করলাম। তারপর এক ভাঁড় টক দই খেলাম, পাঁচ গেলাস জল খেল্যাম তবু ঝাল যায় না। তক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে। তাড়াতাড়ি জানলার ধারে আমার সীটটা দখল করে আমি কুকুরের মতন জিভ বার করে হা-হা-হা করতে লাগলাম।

আমার সেই রকম অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য বাসের সব লোকের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল। কেউ কেউ ছুঁড়ে দিয়েছিল দু'একটা সহানুভূতিসূচক মন্তব্য। এক মহিলা একটি সন্দেশ এগিয়ে দিয়ে আমাকে খেয়ে নিতে বলেছিলেন, আর একজন দিয়েছিল এক খিলি পান।

এক সঙ্গে অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে তাই যাত্রীদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। নানা প্রদেশের নানা ভাষার লোক তবু এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সাড়ে ন'জন। আর বাঙালী অবাঙালী মিলিয়ে যুবতী মেয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। যুবতী মেয়েদের কোন জাত নেই।

পনেরো ষোলো জনের একটি ছাত্রদল দখল করে রেখেছে সামনের দিকের অনেকগুলো সীট্ তারা নিজেদের মধ্যে হইহল্লায় মত্ত হয়ে আছে। আর একটি আট ন' বছরের বাচ্চা মেয়ে কিছুতেই নিজের জায়গায় বসবে না।ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাসের মধ্যে, কখনো বসে পড়ছে অচেনা লোকের পাশে। এইটিই আমাদের সাড়ে নয়তম বাঙালিনী।

অচেনা শিশু এবং অচেনা কুকুরকে আমি রীতিমতন ভয় করি। এদের ক্যাকে যে কখন একটু আদর করতে গেলে চ্যাঁচামেচি করে উঠবে তার ঠিক নেই। একবার একটি বাচ্চা মেয়েকে দেখে আমি বলেছিলাম, বাঃ একে তো খুব সুন্দর দেখতে, ঠিক পুতুলের মতন।তাই শুনেই মেয়েটি ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠেছিল, তার বাবা-মায়ের সামনে আমি একেবারে অপ্রস্তুত! 'পুতুলের মতন' বলাটা নাকি অন্যায় হয়েছে।ঐ ফর্সা মেয়েটিকে দেখেই সবাই ঐ কথা বলে, আর তাতেই সে রেগে যায়। সেই থেকে আর কোনো বাচ্চাকে আমি সুন্দর বলি না।

এই মেয়েটি কিন্তু খুব হাসি খুশী আর টরটরে! একটা হালকা নীল ফ্রক পরে প্রজাপতির মতন উড়ে বেড়াচ্ছে। একবার সে আমার পাশে এসে বললো, এই তুমি সরো না, আমি জানলার ধারে বসবো, আমি এদিকটা দেখবো। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, তুমি বুঝি একদম ঝাল খেতে পারো না? আমি পারি।

তাকে বসতে দিলাম। মেয়েটির নাম জিয়া। তার একটা ভালো নামও আছে, সেটা বেশ খটমটে। দু'তিনবার শোনার পর বুঝতে পারলাম ওর ভালো নাম ঋতুপর্ণা।

জিয়ার মাথায় টগবগ করছে হাজার প্রশ্ন। এটা কি গাছ? এটা কি পাখি? ঘুঘু পাখিরা কি খায়? একটা ঘোড়া একলা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

জিয়ার বাবা-মা বসেছেন অনেকটা দূরে, তাঁরা বার-বার মেয়েকে ডাকছেন, সে কিছুতেই যাবে না। আমার পাশেই বসেছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, তিনি বাস চলার পরই ঘুমোতে শুরু করেছিলেন। জিয়া তাকেও জাগিয়ে দিল। ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন না, জিয়ার ভাষা না বুঝেও মজা পেতে লাগলেন।

আমার ডান পাশে লম্বা সীটটায় বসেছে একটি যুবক ও দুটি যুবতী। এই তিনজনের মধ্যে সম্পর্কটা যে ঠিক কি, তা অনেকক্ষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। মেয়ে দুটি দু'বোন? কিন্তু মুখের কোনো মিল নেই। দুই বান্ধবী? তা হলে সঙ্গে একটি যুবক কেন? মনে হলো ওদের মধ্যে একজন ঐ যুবকটির স্ত্রী, সদ্য বিবাহিত। ওরা কাশ্মীরে হনিমুনে যাচ্ছেন। হনিমুনে যাবার সময় কোনো মেয়ে তার বোন কিংবা বান্ধবীকে সঙ্গে নেয়? ব্যাপারটা বুঝলাম না। যুবকটি একজনের সঙ্গেই কথাবার্তায় মত্ত, অন্যজন চুপচাপ বসে আছে। মনে মনে আমি সেই মেয়েটির নাম দিলাম অনাদৃতা। অনাদৃতা কিন্তু যথেষ্ট সুন্দরী।

পাঠারকোট পর্যন্ত সাংঘাতিক গরম ছিল, জম্মু পর্যন্ত এসেও গরম কমবার নাম নেই। অনেকেই বাক্স থেকে সোয়েটার আর শাল বার করে রেখেছে, কিন্তু কোথায় শীত? বাস যখন সমতল ভূমি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে লাগলো, তখন পিঠের ঘাম শুকলো।

অনেক বাচ্চা প্রথম পাহাড়ে উঠে একটু ভয় পায়। জিয়ার ভয় ডর কিছু নেই। আমার জানলার পাশেই খাদ, অনেক নীচে বাড়িঘর, মানুষগুলোকে ছোট্ট দেখায়। তা দেখে জিয়ার দারুণ আনন্দ। সে মুখ বাড়িয়ে একবার সেই অনাদৃতা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোমরা ছোট্ট ছোট্ট মানুষ দেখতে পাচ্ছো?

অনাদৃতা জিয়ার কথা বুঝতে পারলো না। মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেয়া?

জিয়া আবার বাংলাতে সেই এক কথাই বললো।

অনাদৃতা তখন আমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকিয়ে বললো, কেয়া পুছতি হ্যায় ইয়ে লেডকি?

আমার হিন্দীজ্ঞান বড়ই শোচনীয়। তবু কোনো রকমে বুঝিয়ে বলতে হলো। মেয়েটি তখন হেসে জিয়াকে উত্তর দিল, নেহি, কুছ নেহি হ্যায় ইধার!

এই মেয়েটি জানলার ধারে বসতে পারে নি। সেখানে বসেছে অন্য মেয়েটি। মাঝখানে যুবকটি সেই মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে ওদিকে ফিরে আছে। সাধে আর কি আমি এর নাম দিয়েছি অনাদৃতা?

জিয়া বললো, তুমি এদিকে এসো না, এদিকে এসো, দেখতে পাবে। এ-ই-টু-কু ছোট্ট ছোট্ট মানুষ।

অনাদৃতা কি করে এদিকে আসবে? তা হলে আমাকে বা পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে উঠে যেতে হয়। উঠে কোথায় যাবো?

মেয়েটি এলো না। জিয়া আরও কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা চালালো। মেয়েটি বাংলা জানে না, জিয়া বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। সুতরাং আমাকেই দায়িত্ব নিতে হলো অনুবাদ কর। এই সুযোগ মেয়েটির সঙ্গে আমার খানিকটা ভাব হয়ে গেল।

বাস থামলো একজায়গায়। নেমে একটু হাত পা ছড়িয়ে নিতে হবে। অনাদৃতার সঙ্গের অন্য মেয়েটি আর যুবকটি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল গাছের আড়ালে। চুমটুমু খাবে বোধহয়। অনাদৃতা একলা একলা বসে রইলো বাসেই।

আমি তাকে একটু সঙ্গ দেবো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু জিয়া জোর করে আমার হাত ধরে টেনে নামালো। ওর বাবা-মা বললেন, মেয়েটা আপনাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে, না?

আমি ভদ্রতা করে বললাম, না, না!

জিয়া ছুটে ছুটে খাদের ধারে যেতে চায়, আমাকেই সামলাতে হবে দেখছি। সেখানে শক্ত করে আমি তার হাত ধরে থেকে বাসের দিকে তাকাই। অনাদৃতা একা বাসের মধ্যে বসে আছে। আমার ইচ্ছে হলো, হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকি। বাইরে কি সুন্দর দৃশ্য, ও কেন বাসের মধ্যে বসে থাকবে? কিন্তু ওর সঙ্গে এখনো ততটা পরিচয় হয় নি, যাতে হাতছানি দেওয়া যায়।

আবার বাস ছাড়লো, এবং একটু পরেই একে একে বমি শুরু হলো। প্রথমেই বমি করলো অনাদৃতা। তারপর জিয়ার মা, তারপর মেয়েদের মধ্যে আরও তিনজন এবং দু'জন পুরুষ। এই রাস্তায় এরকম হয়।

অনাদৃতাকে এবার জানলার ধারের সীট দিতেই হলো। মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে বমি করছে। চোখ দুটো করুণ হয়ে এসেছে। লজ্জা এবং কষ্ট দুরকমই বোধ করছে একসঙ্গে।

এক জায়গায় হঠাৎ আমি রোককে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। এ বাস যেখানে সেখানে থামে না। তবু জোর করে থামানো হলো। আমি একটু দূরে একটা ঝরণা দেখতে পেয়েছিলাম, ঠিক রাস্তার পাশেই। একটু পেছনে ফেলে এসেছি।

জিয়াকে বললাম, চলো, ঝরণা দেখে আসবে?

দু'জনে নেমে ছুটলাম। আমার কাঁধে ঝোলানো ওয়াটার বট্‌ল ছিল। ঝরণার কাছে এসে পুরোনো জল ফেলে দিয়ে ওয়াটার বট্‌লে ঝরণার জলভরে নিলাম। খুব ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার জল। বাসের কাছে এসে এপাশের জানলা দিয়ে অনাদৃতাকে আমার ভাঙা হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে বললাম, এই জলটা দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন, খুব ঠাণ্ডা জল, ভালো লাগবে!

অনাদৃতা প্রথমে অবাক হলো, তারপর ওর চোখে মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠলো। আমার কাছ থেকে ওয়াটারবট্‌লটা নিতে দ্বিধা করলো না।

ঝরণার কথা শুনে অনেকেই নেমে পড়লো। অনেকে সেদিকে গেল। অনাদৃতাও নামলো। মেয়েটি বেশ লম্বা, লাল শাড়িও লাল ব্লাউজে বেশ একটা অগ্নিশিখার মতন ভাব, পেছন থেকে তার কোমর, পিঠ কাঁধ অনেকটা ভি অক্ষরের মতন দেখায়।

হঠাৎ বাস থামাবার জন্য ড্রাইভার একটু রাগারাগি করছিল। তারপর সে নিজেই কিছু গণ্ডগোল করলো কিনা কে জানে, বাসটা আর ঠিক মতন চললো না। মাঝে মাঝে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করতে লাগলো। গীয়ারেরও নাকি গোলমাল দেখা দিয়েছে। পাহাড়ী রাস্তায় কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ঠিক হলো কুদ বলে একটা জায়গায় গিয়ে দেখতে হবে, অন্য বাস পাওয়া যায় কিনা। বাস বদলাতেই হবে।

কুদ-এ পৌঁছে দেখাগেল আর বাস নেই। পাঠানকোট বা জম্মু থেকে সব বাস ভর্তি হয়েই আসছে, তাতে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং কুদ-এই আমাদের রাত কাটাতে হবে। তাতে আমি অবশ্য খুশীই হলাম। রুটিন ছাড়া নতুন জায়গায় থাকতে আমার বেশ ভালো লাগে।

কুদ জায়গাটা বিশেষ বড় নয়। এখানে একটি বিখ্যাত জেল আছে।এক সময় অনেক রাজনৈতিক নেতাই ঐ জেলে দিন কাটিয়ে গেছেন। এছাড়া আর দু'চারটে দোকানপাট, একটা ধর্মশালা, আর একটা হোটেল।

ধর্মশালায় আমার জিনিসপত্র রেখেই আমি জেলটা দেখতে গেলাম। তারপর আরো খানিকটা ঘুরেটুরে যখন ধর্মশালার কাছে ফিরে এলাম, হঠাৎ সন্ধে হয়ে এসেছে। একটা দোকানে পুরী ভাজছে। খাঁটি ঘিয়ের এমন উগ্র গন্ধ যে, গা গুলিয়ে ওঠে। ঐ খাবার খেলে সহ্য হবে কিনা ভাবছি!

কুদ-এ ফিনফিনে শীত। চারপাশে বড় বড় পাহাড়। আকাশ এখানে নীচু হয়ে এসেছে। পুরুষের দল ধর্মশালায় উঠেছে, যাদের সঙ্গে নারী রয়েছে, তারা গেছে হোটেলে। ধর্মশালাটা বেশ নোংরা, তাও এক ঘরে অনেককে গাদাগাদি করে শুতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবার পর আর কিছুই করার নেই। এক্ষুনি শুয়ে পড়ারও কোনো মানে হয় না। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হঠাৎ কী রকম যেন মন খারাপ লাগছে। শুনেছি, উঁচু পাহাড়ে উঠলে মানুষের এরকম যখন তখন মন খারাপ হয়, একাকীত্ব তীব্র হয়ে ওঠে।

এক সময় দেখলাম হোটেলের চত্বর থেকে নেমে এলো অনাদৃতা। যুবকটি আর অন্য মেয়েটি নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুয়ে পড়েছে। অনাদৃতার আসল নাম কি, তা এখনো জিজ্ঞেস করা হয় নি।

আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম,ও আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ তুলে তাকালো, একটু হাসলো, বললো, হ্যালো!

আমি ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন?

—একটু হেঁটে আসতে যাচ্ছি।

এর পর আমারই বলা উচিত ছিল, আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? কিন্তু সে কথা হলো না। বরং আমি আশাকরে রইলাম, মেয়েটিই বলবে, আপনি চলুন না আমার সঙ্গে একটু!

মেয়েটি সে কথাও না বলে লাজুকভাবে হেসে এগিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি ওকে যেতে দিলাম একা। আকাশে জ্যোৎস্না নেই, তবে ঘুরঘুটে অন্ধকারও নয়. বেশ কিছু দূর পর্যন্ত মেয়েটিকে দেখা যায়, তারপর আর দেখা যায় না।

আমি একা একা দাঁড়িয়ে পরপর দুটো সিগারেট শেষ করলাম। তারপর মনে হলো, আমার মতন নির্বোধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আমার কোনো কাজ নেই। একলা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর ঐ মেয়েটি, যার সঙ্গীরা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না।সেও একলা বেড়াতে বেরিয়েছে।এখন আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক নয় কি ওর সঙ্গেই যাওয়া? কেন গেলাম না? মেয়েটি আমাকে দেখে হেসেছে।

সুতরাং নিশ্চয়ই আমাকে একেবারে অপছন্দ করে না! তবে, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে বললো না কেন? বোধহয় লাজুক। কিংবা আমারই বলা উচিত ছিল!

এখন যাবো? কেন নয়?

আমি সেইদিকেই এগোলাম। একটু দূরে ডান দিকে একটা ছোট টিলা, সেখানে একটি পাথরের ওপর বসে আছে অনাদৃতা। তারডান পাশে গম্ভীর বিশাল পাহাড়। সামনে খোলা আকাশ। সেই পটভূমিকায় মেয়েটিকে একেবারে অন্যরকম দেখায়। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম অনাদৃতা, এখন ওকে মনে হয় দুর্লভতমা।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। একাকীত্বেরও একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে। এই যে মেয়েটি টিলার ওপর আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছে, আমার মনে হলো, এমন একটা সুন্দর দৃশ্য আমি বহুদিন দেখিনি।

এখন আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালে এই দৃশ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওখানে আমাকে মানাবে না!

আমি দূর থেকেই দেখতে লাগলাম।

উনিশ

একখানা দেড় তে কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি পাবার দারুণ বাসনা ছিল আমার এক সময়। চকচকে কড়িটানা সেরকম কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি দোকানেও কিনতে পাওয়া যেত না। সেরকম ঘুড়ি শুধু রায়দের বাড়ি থেকে আলাদা অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হতো।

রায়দের ঐ ঘুড়িগুলিকে আমরা বলতাম গুণ্ডা ঘুড়ি। আকাশের অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ হুড়মুড় করে নেমে এসে পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে সাফ করে দিয়ে যেত। কখনো যে ওদের ঘুড়িও কেটে যেত না তা নয়, কিন্তু কাটলে তক্ষুনি ঠিক ঐ রকম আর একটা ঘুড়ি রায়দের বাড়ি থেকে উড়েএসে প্রতিশোধ নিয়ে যেত।

রায়দের ঘুড়ি ওড়াবার ব্যাপারে আর একটা বিশেষ চালিয়াতি ছিল। ঘুড়ি একবার তারা আকাশে ওড়ায়, সেটা আর তারা মাটিতে নামায় না। সন্ধেবেলা, যখন তারা পাড়ার আর সব ঘুড়িকে কেটে ছারখার করেছে, তারপর তারা নিজেদের ঘুড়ির সুতো ইচ্ছে করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত।

সেই ঘুড়ি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত পাড়ার ছেলেদের মধ্যে। সাধারণত সন্ধেবেলায় সেই শেষ ঘুড়ি উড়ে যেত অনেক দূরে, অন্য কোনো পাড়ায় কিংবা মনে হতো যেন নিরুদ্দেশে। আকাশের অনেক উঁচুতে ঐ কালো চাঁদিয়াল রাত্রির সঙ্গে মিশে যাবে, কোনোদিন মাটিতে নামবে না। কেউ কেউ অবশ্য বলতো, ঐ ঘুড়িগুলো উড়ে গিয়ে গঙ্গায় পড়ে। রায়রা প্রত্যেকদিন ঐভাবে ঘুড়ি দিয়ে গঙ্গা পুজো দেয়। উত্তর কলকাতায় আমাদের পাড়া থেকে গঙ্গা খুব দূরে ছিল না।

অবশ্য পাড়ার দু'তিনজন ছেলে ঐ ঘুড়ি ধরেছে, তারপর সগর্বে সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছে। যাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা আছে বা কখনো ছিল, তারা বুঝতে পারবে সুতো সমেত একটা জ্যান্ত ঘুড়ি ধরে ফেলার আনন্দ কতখানি! লটারিতে টাকা পাওয়ার চেয়েও বেশী। ঐ কালো চাঁদিয়াল যে ক'জন পেয়েছে, প্রত্যেকেই সেটা টাঙিয়ে রেখেছে ঘরের দেয়ালে, বিশেষ কোনো প্রাইজের মতন।

আমি কখনো পাই নি। সেইজন্য আমার মনের মধ্যে বেশী তীব্র দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ তীব্রতর হল আরও একদিন, যেদিন আমি ঐ রকম একটা ঘুড়ি পেয়েও হারিয়েছিলাম!

সেদিন সন্ধেবেলা রায়রা হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিয়েছে,আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছি। হাওয়ায় বেশ জোর ছিল, আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যদি গঙ্গাপর্যন্ত হয়, তাও গিয়ে দেখে আসবো!

কিন্তু সেদিন ঘুড়িটা বেশী দূর গেল না, আহিরীটোলার কাছে এসে গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে নীচে নামতে রাগলো। আমি তাকিয়ে দেখি, আমার পিছনে আর কোনো অনুসরণকারী নেই। আবছা আবছা

অন্ধকার হয়ে এসেছে, অন্য কেউ আকাশের ঐ কালো রঙের ঘুড়িটা দেখতেও পাবে না। শুধু আমার চোখই ওকে দেখবে।

আমার বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। তাহলে সত্যিই এতদিন বাদে আসবে আমার হাতে রায় বাড়ির কালো চাঁদিয়াল। এতদিনের স্বপ্ন!

ঘুড়িটা শেষ গোত্তা খেয়ে পড়লো একটা বাড়ির উঠোনে। আমিও কোনো চিন্তা না করে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

বাড়িটা আমার মুখ চেনা। সেটাও আর এক রায়েদের বাড়ি। পুরোনো কলকাতার বনেদী বেনেদের বাড়ি যেমন হয়। সামনে লোহার গেট, এক সময় সেখানে দারোয়ান থাকতো। এখন থাকে না। হয়তো সেখানে এককালে গেটের মাথায় নহবৎখানায় নিত্য গানবাজনাও হতো—এখন ইঁট ভেঙে পড়ছে। ভেতরে খানিকটা বাগান, এককালে সেখানে ছিল ফোয়ারা ও নগ্ন নারীমূর্তি—এখন আগাছার জঙ্গল। নারীমূর্তির নাক ভাঙা, হাত ভাঙা। এক পাশে আস্তাবল, জুড়িগাড়ির ঘোড়াগুলো রাখার জন্য—এখন ঘোড়া জুড়িগাড়ি কিছুই নেই।আস্তাবলটায় একটা সাইকেল সারাবার দোকান হয়েছে।

যাওয়া আসার পথে বাড়িটা অনেকবার দেখেছি। ও বাড়ির একটা ছেলে একসময় আমাদের স্কুলে পড়তো, পড়াশুনোয় একেবারে অগার্মাকা, ক্লাস এইটে উঠেই পড়া ছেড়ে 'বিজনেস' করতে চলে গেল।

বাড়ির গেটটা হাট করে খোলা, সুতরাং সে বাড়ির বাড়ানে গিয়ে ঘুড়ি ধরবার জন্য কোনো দ্বিধাই করি নি। ঘুড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা পেয়ারা গাছে। সুতোটা নীচে ঝুলছে। সুতোটা ধরে সবে মাত্র টান দিয়েছি, এমন সময় কে একজন হুংকার দিয়ে বললো, এই কে রে ওখানে?

তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের সঙ্গে যে গজেন পড়তো, তার মেজাকাকা। অর্থাৎ এ বাড়ির মেজবাবু। গজেনের মুখে শুনেছিলাম, উনি রেস খেলেন। অবশ্য সেটা যে ঠিক কী রকম খেলা, তা তখন জানতাম না!

মেজবাবুর বয়েস তখন বেশী না, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরহবে। চেহারা ও গলার আওয়াজ ঠিক বনেদীবাড়ি সুলভ। ধপধপে ফর্সা রং, লম্বা, মুখে একটা পুরুষ্ট গোঁফ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। একটা সাদা গেঞ্জি আর সিল্কের লুঙ্গি পরে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে একটা সোনার তাগা।

আমি বললাম, আমার ঘুড়িটা এখানে পড়েছে, তাই নিতে এসেছি!

কে তোকে ভেতরে ঢুকতে বলেছে? এই রঘু, দ্যাখ তো!

আমি তখনও ঘুড়িটা ধরে টানছি! সেটা নেমে এলেই দৌড়ে পালাবো। ঘুড়িটা সহজেই গাছ থেকে নীচে এসে পড়লো। কিন্তু আমি সেটা তুলে নেবার আগেই একজন হুঁৎকো মতন লোক ভেতর থেকে এসে আমার ঘাড় চেপে ধরলো।

আমি বললাম, ওটা আমার! ওটা আমার!

লোকটা পা দিয়ে ঘুড়িটা চেপে ধরে আমাকে জোরে একটা ধাক্কা দিল। ওরপর থেকে মেজোবাবু বললে, রঘু ওটা ওপরে নিয়ে আয়।

আমি বুঝলাম, ঘুড়িটা আমি পাবো না। কিন্তু এই লোকটা আমাকে মারবে কেন?

আমি মেজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখুন, ও আমায় মারছে!

মেজবাবু হ্যা-হ্যা-করে হেসে বললো, মারবে না কি আদার করবে? যত সব চোর ছ্যাঁচোড় যখন তখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম, আমি গজেনের বন্ধু।

মেজবাবু বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে বললো, তবে আর কি, কৃতার্থ করেছ! গজেনের বন্ধু। সবকটাই তো হতভাগা! বদমাইশ। যা ভাগ এখান থেকে!

কালো চাঁদিয়ালটার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে আমি ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। আমার সারা গা জ্বালা করছে। ঘাড়ের কাছে কেউ যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। বাড়িটার সামনে রাস্তায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, সমস্ত পৃথিবী আমার শত্রু।

তারপর সেই বাড়িটার গায়ে থুক্ করে থুতু ফেলে বললাম, তোমায় আমি দেখে নেবো, শালা!

জীবনে সেই প্রথম শালা কথাটা উচ্চারণ করলাম আমি!

কিন্তু এক বনেদী বাড়ির মেজবাবুকে আমার মতন সামান্য এক স্কুল মাস্টারের ছেলে কীভাবেই বা দেখে নেবে! কোনো প্রতিশোধই নেওয়া হলো না। শুধু মনের মধ্যে রাগ পোষা রইলো। মাঝে মাঝে ঐ বাড়িটার পাশ দিয়ে যাই, আর ঘৃণার চোখে তাকাই। লোকটার মুখ আমি ভুলি নি, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘুড়ি ধরার শখ অবশ্য আমার কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল। আকাশের দিকে চোখ আটকে রাখবার বদলে আজ মাটির পৃথিবীতে অনেককিছু দেখার মতন পেয়ে গেছি।

কলেজে পড়ার সময় একদিন আমার জীবনের প্রথম বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গেছি গঙ্গার ধারে। হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি। নদীর ধারে বৃষ্টিতে ভেজার মতন আনন্দের আর কিছুই নেই। সব লোক যখন ছুটোছুটি করছে আমরা দু'জন তখন মন্থর পায়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খুব জোরে বাতাস দিলে বৃষ্টিকে মনে হয় পাতলা চাদর। গঙ্গার ওপর তখন শত শত পাতলা চাদর উড়ছে।

তা তো হলো। কিন্তু ফেরার পথে ঐ রকম ভিজে জামাকাপড় নিয়ে ট্রাম বাসে ওঠা যায় না। মেয়েদের পক্ষে ভিজে শাড়ি পরে পথ দিয়ে হেঁটে আসারও অসুবিধে আছে। আমার পকেটে চারটে টাকা ছিল, সেটা দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে ভরে রেখেছিলাম, যাতে ভিজে না যায়। সুতরাং অনায়াসেই ট্যাক্সি চাপতে পারি। কিন্তু ট্যাক্সি আর কিছুতেই পাই না। ঠিক এই সময় কোনো ট্যাক্সিই কি খালি থাকতে নেই। বহু ছুটোছুটি করলাম, বান্ধবীর কাছে আর প্রেস্টিজ রাখা যায় না। তারপর একবার রাস্তার উল্টো দিকে একটা ট্যাক্সি থামলো। তক্ষুনি খালি হলো। আমরা দু'জনেই ট্যাক্সি! করে চেঁচাতে লাগলাম। ড্রাইভার আমাদের দেখলো। আমরা ছুটে রাস্তা পার হয়ে এলাম। কিন্তু ট্যাক্সিটার কাছে পৌঁছানোর আগেই আর একজন সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লোক দরজা খুলে ঝট্ করে উঠে বসলো।

আমি গিয়ে বললাম, একি, আমরা আগে ডেকেছি।

লোকটা আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ড্রাইভারকে বললো, চলো, চলো!

আমি ড্রাইভারকে বললাম, কেয়া? হামলোগ আগে নেহি বোলায়া?

ড্রাইভার বললো, হাম কেয়া করেগা।

আমি সিল্কের পাঞ্জাবিতে বললাম, আপনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন না। আমরা আগে এটা ডেকেছি!

লোকটা উত্তর দিল না। ড্রাইভারকে বললো, চলো! দেরি কাহে করতা!

এবার আমি লোকটাকে চিনলাম। সেই রায়বাড়ির মেজবাবু। আমার মনে পড়ে গেল পুরনো কথা। সেই সুন্দর নির্দয় মুখ। মনে হলো, এই লোকটা আমার জীবনের চরম শত্রু।

ট্যাক্সি ছেড়ে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ঠিক আছে, একদিন দেখে নেবো।

তাও কিছু দেখে নেওয়া হয় নি!

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। সে পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন। উত্তর কলকাতার ঐ অঞ্চলটায় আর যাওয়াই হয় না। বছর পাঁচেক বাদে একদিন হঠাৎ কোনো কারণে ঐ পাড়ায় গিয়ে চমকে উঠলাম। সি আই টি থেকে নতুন রাস্তা বানিয়েছে, তাতে সেই রায়বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সে বাড়ির আর চিহ্নও কোথাও নেই। রায়বাড়ির বাগানে যে-জায়গাটায় আমি ঘুড়ি ধরতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলাম, আন্দাজে বুঝলাম, সেই জায়গাটা এখন রিকশা স্ট্যাণ্ড হয়েছে। কুড়ি পঁচিশখানা রিকশা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেললে অনেকের দুঃখ হয়।কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে আমার একটুও দুঃখ হলো না। মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে। এই সমস্ত পুরনো বাড়ি না ভাঙলে শহরের উন্নতি হবে কী করে? রাস্তাটার জন্য উপকার হয়েছে কত লোকের।

এর পরও কেটে গেছে বেশ কিছু বছর। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি আমার এক পরিচিত প্রেসের অফিস ঘরে বসে চা সিঙ্গাড়া খাচ্ছি।এমনসময় একজন বুড়ো মতন লোক ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

প্রেসের মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

লোকটা একটা ছোট বাক্স খুলে, কিছু শস্তা ধরনের পেন আর ডট পেন্সিল বার করলো, তারপর বলো, আমরা এগুলো নতুন বার করেছি, যদি লাগে একদম নাম্বার ওয়ান জিনিস—

প্রেসের মালিক বললেন, এটা ছাপাখানা মশাই। এখানে পেন-পেন্সিল দিয়ে কী হবে? এটা তো স্কুল নয়।

লোকটি বললো, তাও যদি একটু ট্রাই করে দেখেন। বাঙালীর তৈরি—

চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি, গলার আওয়াজে চিনতে পারলাম। সেই রায়বাড়ির মেজবাবু।

এতটাতো বুড়িয়ে যাবার কথা নয়। ফর্সা লম্বা সুপুরুষ ছিলেন। এখন চেহারাটা পাকিয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে মুখের চামড়া।গায়ের জামাটা খুব ময়লা হলেও সিল্কের। গলায় আওয়াজটা অবশ্য সেইরকম বাজখাঁই আছে—অনেকটা যাত্রাদলের সেনাপতির মতন।

আমি স্তম্ভিতভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি, চেনবার কোনোকথাই নয়। কিন্তু আমি ভুলি নি। কৈশোরের ক্রোধ ও অভিমান কখনো মোছে না। এই আমার সেই জন্মশত্রু, যার ওপর আমার প্রতিশোধ নেবার কথা। সে এত কাছে।

কিন্তু এর ওপর আমি কী প্রতিশোধ নেবো? ওর ওপর আমার আবার রাগ হলো। কেন ও আমার প্রতিশোধের অযোগ্য হয়ে গেল? ও যদি শক্ত সমর্থ চেহারায় আগেকার মতন দর্প নিয়ে এখন এসে এখানে দাঁড়াতো, আমি ঠিক উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অপমান করতাম। ওকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান জানাতাম। তার বদলে ও কেন এমন মলিন, এমন হৃতশ্রী দুর্বর হয়ে আমার সামনে এলো?ও আমাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিল না। আমার আগেই অন্য কেউ, কিংবা অনেকে ওর ওপর সেই প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে।

লোকটি তখনও ঘ্যানঘ্যান করছিল, প্রেসের মালিক বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে যান না মশাই। বলছি তো লাগবে না! এটা কি ইস্কুল?

লোকটি বললো, একটা অন্তত নিন!

ট্রেনের কামরায় এরকম কলম ফেরি করতে দেখেছি, কিন্তু লোকের বাড়ি বাড়ি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাবসাটা আপনার নিজের? মনে, আপনার কোম্পনি?

লোকটি বললো, না, না, আমি এজেন্সি নিয়েছি।

রেসের খেলা ছেড়ে দিয়ে কেন যে এই এজেন্সির খেলা উনি খেলতে নামলেন, তা বুঝলাম না। আমি মুখ ফিরিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

লোকটি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললাম, ঠিক আছে, আমাকে একটা দিন। একটা ডট পেন কিনবো কিনবো ভাবছিলাম।

দেড় টাকা দাম, দু'টাকার নোট দিলাম। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে তালুর উপর রেখে খুব সাভধানে গুণতে লাগলো, ভূতপূর্ব রায়বাড়ির মেজবাবু। তারপর জিভ কেটে বললো, এই রে, পাঁচ নয়া কম আছে যে!

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ঠিক আছে, তাই দিন!

আচ্ছা স্যার, নমস্কার, খুব উপকার করলেন—

আমি আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

বিশ

নার্সিং হোমের কেবিনে বাদলদা'র সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। উনি এসেছিলেন অ্যাপেন্ডিসাইটস অপারেশন করাতে। সে সব নির্বিঘ্নে চুকে গেছে, এখন আর তিন-চার দিনের বিশ্রাম। একা একা ভালো লাগে না বলে উনিআমাদের অনুরোধ করেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য গল্প করে যাবার জন্য।

গল্প বেশ জমে উঠেছিল। ওয়ার্ডবয়কে ধরে আমরা একবার চা আনিয়ে নিয়েছিলাম, দরজা বন্ধ করে সিগারেটও খাওয়া যায়। অরবিন্দ এমন সব মজার মজার গল্প শুরু করেছিল যে এক সময় বাদলদা বাধা দিয়ে বললেন, আর হাসাস্‌নি, আর হাসতে পারছি না, পেট ব্যথা করছে! সেলাই ছিঁড়ে যাবে।

হঠাৎ এই সময় পাশের ব্যরান্দায় কান্নার কলরোল শোনা গেল। আমরা অমনি চুপ করে গেলাম। কয়েকটি মহিলা একসঙ্গে সুর করে কাঁদছে।

আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে। নার্সিং হোমে তো মাঝে মাঝে কেউ না কেউ মারা যাবেই। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে কেন? আমি মৃত্যু একদম সহ্য করতে পারি না। আমি মৃত মানুষের মুখ পারতপক্ষে দেখতে চাই না, পালিয়ে যাই, কেননা কোনো অচেনা মৃত মানুষের মুখ দেখে ফেললেও সেটা আমি আর ভুলতে পারি না।বুকের মধ্যে দাগ কেটে বসে যায়। শোকের কান্না থেকেও আমি যতদূর সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করি, ঐ কান্না শুনলেই আমার ভয় হয়, আমার বুক কাঁপে। মৃত্যুর মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গোঁয়াতুমি আছে—ঘটনাটা আর কিছুতেই বদল করা যায় না, তাই তাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করি। মৃত্যুর ব্যাপারে আমি স্বার্থপর।

দরজাটা ফাঁক করে সন্তর্পণে বাইরে তাকালাম। তিন-চারজন মাড়োয়ারী মহিলা বারান্দার মেঝের ওপর বসে পড়েছেন পা ছড়িয়ে, কপালে হাত রেখে মুচড়ে মুচড়ে কাঁদছেন। ডেড বডিটা কি এক্ষুনি বাইরে আনা হবে? তার আগেই আমার পালানো দরকার।

ইচ্ছে করলেই নিশ্বাস চেপে নাকবন্ধ করা যায়, কিন্তু কান বন্ধ করার কোনো উপায় নেই মানুষের। বাদলদা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যতদূর সম্ভব অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে পা টিপে টিপে চলে এলাম বারান্দা দিয়ে। তারপর সিঁড়িতে এসেই দৌড়।যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায় ঐ শোকের কান্না থেকে।

নার্সিং হোমের গেটের কাছে একজন তরুণ ডাক্তার গল্প করছেন অন্য একজনের সঙ্গে। কয়েকদিন আসা-যাওয়ায় ডাক্তারটির সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে-চোখাচোখি হলে দু-একটা কথা বলা উচিত।

ডাক্তরটি এই সময় হেসে উঠলেন হো হো করে।

আমি একটু দমে গেলাম। ডাক্তাররা কী হৃদয়হীন হয়! এইমাত্র এখানে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে কান্না—আর একজন এত উঁচু গলায় হাসছে! জীবন বোধহয় এমনই নির্বকার।

ডাক্তারটি আমাদের দেখেতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চললেন? এখনো তো ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়নি।

আমি বললাম, এই একটু কাজ আছে।

ডাক্তারটি হাসতে হাসতেই বলরেন, ঐ কান্না শুনে পালাচ্ছেন তো?

আমি চুপ করে গেলাম।

ডাক্তারটি তবু বললেন, কেন কাঁদছে তা জানেন তো? এদের নিয়ে আর পারা যায় না!

এবার কৌতুহল জাগ্রত হলো। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী হয়েছে?

—মেয়ে হয়েছে! সাত নম্বর মেয়ে।

—অ্যাঁ?

—গত তিনবছর ধরে তো আমিই দেখছি। প্রত্যেকবারই এই রকম। প্রত্যেকবারই মেয়ে হয়, আর বাড়ির সকলের কান্নাকাটির ধুম পড়ে যায়। একটু লজ্জাও নেই, এই নার্সিং হোমের মধ্যেই।

—মেয়ের জন্য কান্না?

—হবে না! বিরাট ব্যবসা ওদের, অথচ বাড়িতে একটাও ছেলে জন্মায়নি এ পর্যন্ত! আগেকার দিন হলে আরও দু-একটা বিয়ে করে ফেলতো।

অরবিন্দ বললো, আজকাল টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায়, আর নিজের একটা ছেলে পাওয়া যায় না? আপনারা ডাক্তাররা কী মশাই!

ডাক্তারটি বললেন, আমাদের সে চান্স দিচ্ছে কোথায়?

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম। অপরের কান্না নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা আমাদের এই প্রথম, কিন্তু আমরা সত্যি তখন বেশ মজা পাচ্ছিলাম।

বারান্দার ওই মাড়োয়ারী মহিলাদের বেশ সরলই বলতে হবে। মনের দুঃখ তাঁরা চেপে রাখতে পারেননি, কেঁদে ফেলেছেন। কিন্তু এরকম দুঃখ অনেক বাড়িতেই চাপা থাকে। পর পর মেয়ে জন্মালে সেই মেয়েদের বাবার চেয়ে মা-ই বেশী দুঃখ পায়, দেখেছি।

আমার তখন মনে পড়লো রেণুর কথা। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে জন্মালে রেণুর নাম হতো আন্নাকালী (আর না, হে মা কালী!)—কারণ সে তার বাবা-মায়ের ষষ্ঠতমা কন্যা। মাড়োয়ারীর ঘরে সাতটি মেয়ে জন্মালেও খুব একটা বিপদ নেই, কারণ তারা খেতে পরতে পারে ঠিকই এবং সমশ্রেণীর মাড়োয়ারীর সঙ্গে বিয়ে হবে। কিন্তু রেণুর বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য কর্মচারী।

ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় রেণুরা থাকতো। ওদের বাড়িটা বিখ্যাত ছিল ঝগড়ার জন্য। ওফ্ কী ঝগড়া, রেণুর বাবা আর মা ঝগড়া করতেন, এক এক সময় রাস্তায় বেরিয়ে আসতেন পর্যন্ত। কোনো কোনোদিন রেণুর মা, চুলগুলো সব পিঠের ওপর ছড়ানো, শাড়িটা কোনো রকমে জড়ানো—কাঁদতে ছুটে চলে যেতেন কোথায় যেন—না, বাপের বাড়ি নয়, বেচারির কোনো বাপের বাড়ি ছিল না। ফিরে আসতেন একটু বাদেই।

রেণুরা ছ' বোন, কেউই সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্যের জৌলুস নেই, কোনোক্রমে বেড়ে উঠছিল শুধু। রেণুকে তখন আমরা লক্ষ্যই করিনি, বরং তার ওপরের দুই দিদি হেনা আর লাতকেই বেশী মনে পড়ে। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় ওদেরও কণ্ঠস্বর বেশ প্রকট হয়ে উঠছিল।

রেণুর জন্মের আগেই যে তার বাবা মা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে কথা রেণু জানে, আমরা জানি পাড়ার সবাই জানে। ঝগড়ার সময়ই এসব কথা শুনতে পাওয়া যেত। রেণু যখন গর্ভে তখন তার বাবা-মা হাসপাতালে গিয়ে চেয়েছিলেন তাকে নষ্ট করে ফেলতে। ডাক্তাররা রাজি হননি, কারণ তখন রেণুর মায়ের স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে কিছু করতে গেলে তাঁকে বাঁচানোই শক্ত হবে। সুতরাং বাবা-মায়ের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেণু এই পৃথিবীতে এলো।

ঝগড়ার সময় রেণুর মা প্রায়ই বলতেন, এতগুলো মেয়ের বদলে তাঁর একটা ছেলে হলেই সব দুঃখ ঘুচে যেত! তা হলে এই অপদার্থ স্বামীর বদলে সেই ছেলেই তাঁকে ভবিষ্যতে দেখতো! সুতরাং, পুত্র-সন্তানের শখ তখনও তাঁর রয়ে গিয়েছিল বলেই রেণুর জন্মের সাত বছর বাদে তিনি আবার গর্ভবতী হলেন। সেবার তিনি আর কোনো নতুন সন্তান সেবার তাঁর পেটে একটি ছেলেই এসেছিল, তাকে নিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন। দুঃখিনীদের জন্য যে আলাদা স্বর্গ থাকে, সেইখানে।

রেণুর বাবা অবশ্য আর বিয়ে করলেন না, কারণ রেণুর সবচেয়ে বড় বোন হেনার বয়স তখন বাইশ। সে-ই সংসারের কর্ত্রী হলো। যদিও ঝগড়াঝাঁটি কমলো না, হেনা তার মায়ের ভূমিকাটা পুরোপুরিই নিতে পেরেছিল। পাড়ার মধ্যে সেই ঝগড়া-বাড়িটা ঝগড়া-বাড়িই রয়ে গেল।

রেণুর বাবা এর পর এক এক করে মেয়েদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। সে সব কী অদ্ভুত বিয়ে। আমাদের তখন বয়েস কম, তবু বুঝেছিলুম, এই সংসারে প্রত্যেকটি মেয়েকেই বিয়ে করার জন্য একজন করে পুরুষ আছে। গরীব ঘরের কালো মেয়েদের নাকি সহজে বিয়ে হয় না, কিন্তু রেণুর

বোনদের বিয়ে হাতে লাগলো পটাপট করে। আর কী সব বরেদের চেহারা। কারুকে দেখতে দৈত্যের মতন, কারুর আগে তিনটে বউ মরে গেছে, কারুর বয়েস রেণুর বাবার চেয়ে বেশী। কোনো বিয়ে হয় দুপুরবেলা, কোনো বিয়ে সন্ধেবেলা আধ ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। বিয়ের পর মেয়েগুলো যে চলে যায়, আর কোনোদিন ফিরে আসে না।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল রেণুর চতুর্থ বোন লতার বিয়ের সময়। পানাগড় থেকে বর এসেছিল একটি এক বছরের ছেলে কোলে নিয়ে। এক বছর আগে তার বউ মারা গেছে, ছেলেকে কোথাও রেখে আসার জায়গা নেই। সেই ছেলে আবার বাবাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকবে না, অন্য কারুর কোলে যাবে না। বিয়ের সময় ছেলেকে এক পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে, ছেলে হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বাবার কোলে চড়ে বসলো। দারুণ কান্না। কোনো রকমে নমো নমো করে বিয়ে সারা হলো। শুভদৃষ্টির সময় লতা একই সঙ্গে তার বর ও ছেলের মুখ দেখলো।

-এর কিছুদিন পর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেললো রেণু। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল, রেণু ফার্স্ট ডিভিশান ও অঙ্কে লেটার পেয়েছে! সবাই অবাক। ঐ বাড়ির মেয়েরা করপোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে দু-এক ক্লাস পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।এর মধ্যে রেণু যে কখন উঠে গেল কেউ খেয়াল করেনি। সে একটা নিরীহ রোগা পটকা মেয়ে তাকে লক্ষ্যই করেনি কেউ।

আবার ও-বাড়িতে একটা ঝগড়াঝাঁটি ও কান্নার রোল উঠে গেল। এবার ধরনটা একটু অন্য রকম। রেণুর বাবা রেণুকে বকছেন আর মারছেন। আর রেণু কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাবা, আমি পড়তে চাই। আমি কলেজে পড়বো, আমার পড়া ছাড়িয়ে দিও না। রেণুর বাবা কিছুতেই রাজি নন। শেষে যখন ধুপধাপ করে তিনি রেণুকে মারতে লাগলেন, তখন পাড়ার অন্য লোকেরা গিয়ে ছাড়িয়ে দিল। পাড়ার একজন গণ্যমান্য প্রৌঢ় লোক প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনিই রেণুর পড়ার খরচ বাবদ প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন।

সবাই স্বস্তি পেল। অবশ্য, কিছুদিনের মধ্যেই সেই গণ্যমান্য প্রৌঢ়টি রেণুর পড়াশুনোর ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে রেণুদের বাড়িতে এত ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন যে অনেকে আবার বাঁকা কথা বলতে লাগলো।

এর মাত্র বছর খানেক বাদে রেণুর বাবার মৃত্যু হওয়ায় আমাদের পাড়ায় ঝগড়বাড়ির ইতিহাস শেষ হলো। রেণু আর তার আর এক বোনের বিয়ে তখনো বাকি, তারা চলে গেল কোনো এক দিদির কাছে। অবশ্য কেউই গরজ করে নিতে চায়নি, কিন্তু না গিয়ে ওদের উপায় কী?

অনেক গরীব ঘরের মেয়ে কষ্ট করে বড়ো হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত আছে। রেণু যদি একদিন সরোজিনী নাইডু বা শকুন্তলা দেবী হয়ে উঠতো, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু রেণু তা হয়নি। কয়েক বছর বাদে রেণু আমাদের পাড়ায় আবার এসেছিল একদিন। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সে বি-এ পাশ করেছে। অনার্স পায়নি, পার্স কোর্সে। দিদির বাড়িতে থাকা তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়—তার দিদির পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তারা খরচ চালাতে পারছে না। সে একটা চাকরি চায়!

কালো, রোগা বি-এ পাস মেয়ের কি অভাব আছে কলকাতা শহরে? কে তাকে চাকরি দেবে? আমরা অনেকে মিলে চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কিছু সুবিধে করা গেল না। তবে দুটো টিউশানি জুটিয়ে দেওয়া গেল, যাতে কোনোরকমে খাওয়ার খরচটা চলে।

মাত্র মাস দুয়েক আগে রেনুর সঙ্গে আমার দেখা। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস-এ গিয়েছিলাম কী একটা কাজে, সিঁড়ির মুখে রেনুই আমাকে দেখে ডাকলো।

রেণুর স্বাস্থ্যটা একটু ভালো হয়েছে, চোখে মুখেও খানিকটা উজ্জ্বলতা এসেছে। আমাকে দেখে বললো, নীলুদা, তুমি এখানে?

আমি বললাম, আমি তো এসেছি একটা কাজে, তুই এখানে কী করছিস?

—এখানেই তো আমার অফিস। আমি চাকরি পেয়েছি, শোনোনি তুমি? এই তো দু'মাস হলো।

রেণুর চাকরির খবর শুনে সত্যি খুব খুশী হলাম। সারা জীবন তো কিছুই পায়নি মেয়েটা, এবার

একটু মানুষের মতন বাঁচবার চেষ্টা করবে।

বললাম, কোনটা তোর অফিস? চল দেখে আসি। চা খাওয়াবি?

—কেন খাওয়াবো না? নিশ্চয়ই খাওয়াবো!

রেণুর অফিসের দরজার সামনে এসেই চমকে উঠলাম। তারপর ঠোঁটে হাসি এসে যাচ্ছিল, লুকিয়ে ফেললাম সেটা। প্রকৃতির সত্যিই একটা পরিহাসবোধ আছে। বি-এ পাস মেয়ে হিসেবে রেণু তো অন্য কোনো অফিসেও চাকরি পেতে পারতো। ও চাকরি পেয়েছে পরিবার পরিকল্পনার দপ্তরে! এখান থেকে, এতদিন বাদে, রেণু তার বাবামায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে!

একুশ

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, আমার দিদির নামে নানান দেশবিদেশ থেকে ঝকঝকে নতুন স্ট্যাম্প লাগানো খামের চিঠি আসতো। আমরা ছোটরা, ডাকবাক্সে দিদির চিঠি কে প্রথম আবিষ্কার করবে, তাই নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলাম। কারণ, দিদির চিঠি যে প্রথম দেখবে, সে-ই নতুন স্ট্যাম্পগুলো পাবে।

দিদির চিঠি আসতো অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এই সব জায়গা থেকে। যারা চিঠি লিখতো, তারা দিদিকে কখনো চোখে দেখেনি, দিদিও তাদের দেখেনি। এরা সবাই পেন ফ্রেণ্ড। দিদি তখন মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু তখনই ইংরিজিতে বেশ বড় বড় চিঠি লিখতে পারে বলে আমরা রীতিমতন অবাক হয়ে যেতাম। তবে দিদির হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর—পাতলা ফিনফিনে কাগজে দিদি তার মুক্তোর মতন অক্ষরে বন্ধুদের চিঠি লিখতো।

বন্ধুরা সবাই ছবি পাঠাতো দিদিকে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে উইলো গাছের নীচে দাঁড়ানো একটি ফুটফুটে জাপানী মেয়ের ছবিই আমাদের বেশী মুগ্ধ করেছিল। মেয়েটিকে ঠিক যেন পুতুলের মতন দেখতে। সে এমনকি দিদিকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেছিল জাপানে গিয়ে তাদের বাড়িতে থাকবার জন্য। আর অস্ট্রেলিয়ার একটি গম্ভীর মুখের ছেলে দিদিকে চিঠি লিখতো আট প্যাতা ন' পাতা করে।

একবার বিলেত থেকে এক বাক্স রুমাল এলো দিদির নামে। বিলেত থেকে তার এক বান্ধবী পাঠিয়েছে। এর উত্তরে দিদিরও কিছু পাঠানো উচিত। কিন্তু কী পাঠানো যায়? নানারকম জিনিসের কথা চিন্তা করা হলো, কিন্তু কোনোটাই ঠিক পছন্দ হয় না, শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, বাইরে আমাদের দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস চা—সেই চা পাঠানো হবে এক প্যাকেট। শুধু বিলাতের বন্ধুকেই নয়, দিদির সব বন্ধুকেই খুব ভালো জাতের দার্জিলিং চা পাঠানো হলো উপহার হিসাবে। পত্রবন্ধুরা অভিভুত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানালো। এবং তারাও সবাই উপহার পাঠাতে লাগলো নানারকম।

জাপানী মেয়েটি পাঠিয়েছিল একটা হাত পাখা। ভারী সুন্দর জিনিসটা। সাধারণত জাপানী পাখা যেরকম ছবিতে দেখা যায়, এটা সে রকম নয়—এটার রং সবুজ। গোটানো পাখাটাকে খুললে মনে হয় যেন ঠিক একগুচ্ছ গাছের পাতা।

আমরা সাধারণত ভালো জিনিস পেলে সেটা ব্যবহার করি না, আলমারিতে তুলে রাখি। বিলিতি জিনিস হলে তো কথাই নেই। দিদিও তার বন্ধুদের পাঠানো জিনিসগুলো সযত্নে তুরে রাখলো কাচের আলমারিতে, কারুকে হাতই দিতে দেয় না। এক সময় দিদির চিঠিপত্রের স্রোত বন্ধ হয়ে গেল, বড় হবার পর দিদির আর ইংরাজি ভাষায় সেরকম দখ তাও দেখা গেল না। কিন্তু সেই উপহারের জিনিসগুলো রয়েই গেল।

কয়েক বছর বাদে দেখা গেল, সেই জাপানী পাখাটির ভেতরে একটু ফুটো হয়ে গেছে রংটাও খানিকটা জ্বলে গেছে। তবু জিনিসটা এখনো দিদির খুব প্রিয়।

সে বছরই আমরা সদলবলে আগ্রা বেড়াতে গেলাম। জুন মাসের সাংঘাতিক গরম, ঐ সময় কেউ উত্তর ভারতের ঐ সব উত্তপ্ত জায়গায় বেড়াতে যায় না। কিন্তু সেই সময় আমাদের স্কুলের ছুটি যে!

পুজোর ছুটিতে আমাদের বেশী দূর বেড়াতে যাওয়া হয় না, কারণ তার পরেই পরীক্ষা।

সেবার অবশ্য আগ্রায় যাবার আর একটা গুপ্ত কারণ ছিল। আমাদেরই এক মাসতুতো দাদা, রমেনদা, তখন থাকতেন আগ্রায়। তাঁর আবার এক বন্ধু আগ্রাতেই সেনাবাহিনীতে উপসেনাপতি। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, খুব বড় বংশের ছেলে। তাঁর সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে। বাবা-মা ঠিক করেছিলেন আগ্রাতে বেড়াতে যাবার ছুতোয় পাত্রটিকে দেখে আসবেন—পাত্রও দিদিকে দেখবে। এ খবর আমরা ছোটোরা কেউ তখন জানতুম না, কিন্তু দিদি নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছিল।

যাবার পথে ট্রেনে যখন আমরা গরমে ছটফট করছি, দিদি তখন তার হাতব্যাগ থেকে সেই গোটানো পাখাটা বার করলো। এতদিন বাদে দিদি তার শখের জিনিসটা ব্যবহার করতে চায়। তখন অবশ্য বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম যে বিয়ের কথা শুনলে সব মেয়ের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসে। দিদির মুখ চোখও যেন খানিকটা বদলে গিয়েছিল। চোখ দুটি বেশী উজ্জ্বল, মুখের রংটা বেশী লালচে। এবং জীবনের এত বড় একটা ঘটনার সম্মানেই দিদি আলমারি থেকে পাখাটা বার করে এনেছে।

আমরা ছোটোরা জানলার ধারে বসবার জন্য সর্বক্ষণ মারামারি করছিলাম। কেউ একটু উঠে গেলেই অন্যজন সেইখানে ঝপাস করে গিয়ে বসে পড়ে। জানলা মোটে দুটো, আর ছোটোরা চারজন।

দিদি হাত পাখাটা বার করবার পর আমাদের মনোযোগ গেল সেদিকে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হাত পাখাটা একটু নিই। পাখাটা আগের মতন আর সুন্দর নেই।তবু ওটার আকর্ষণ আমাদের কাছে কমে নি। দিদি পাখাটা একটু নামিয়ে রাখলেই আমরা কেউ না কেউ সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিই। ঠিক একগুচ্ছ সবুজ পাতার মতন পাখা-তাতে হাওয়া অবশ্য খুব বেশী হয় না, কিন্তু মনের খুব আরাম হয়।

শেষ পর্যন্ত বোকার মতন কাজটা করলাম আমিই। পাখাটা সমেত আমার ডান হাত অন্যমনস্কভাবে একবার বাড়িয়েছিলাম জানলার বাইরে, পরক্ষণেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ওমা! কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই। পাখাটা আমার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে, জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। চলন্ত ট্রেন থেকে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা আর কেউ কখনো পায়না।

ব্যাপারটা সবাই যখন বুঝতে পারলো, তখন আমার ওপর শুরু হয়ে গেল বকুনির ঝড়। বাবা, মা আর সবাই মিলে আমায় নিয়ে পড়লেন। শুধু ঐ পাখা হারানোই নয়-এর আগেও যতদিন যতরকম দোষ করেছি সব টেনে আনা হলো।

শুধু দিদি বললো, যাকগে গেছে যাক। নীলু তো আর ইচ্ছে করে ফেলেনি! পুরোনো জিনিস, এমন আর কি।

দিদির এই কথাটার জন্য আমি দিদির কাছে সারা জীবনের মতন কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। কারণ শুধু দিদির কথা ভেবেই আমি খুব অনুতপ্ত বোধ করেছিলাম। একটা পাখা হারানো এমন কিছু ব্যাপার নয় কিন্তু যেহেতু ওটা ছিল দিদির খুব প্রিয় জিনিস, তাই ওটা নিয়ে অসাবধানে খেলা করা আমার অন্যায় হয়েছে। দিদি যখন আমার গায়ে হাত দিয়ে বললো, যাকগে ও নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না।তখন আমার চোখে জল এসে গেল।

আমি মন খারাপ করে বসে রইলাম। আমার মনে পড়লো সেই জাপানী মেয়েটির ছবির কথা। ছবিতে কারুর বয়েস বাড়ে না। সেই তুলতুলে পুতুলের মতো মেয়েটি হাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট নিয়ে ইউলো গাছের নীচে দাঁড়ানো—কত দূর জাপান থেকে সে পাঠিয়েছিল। একটা পাখা, সেটা শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের ট্রেন লাইনের পাশে পড়ে রইলো একা একা।

তারপর স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে গেল, আমার আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগলো না। দিদি বারবার বলতে লাগলো, এই, তুই মন খারাপ করছিস্ কেন? আমি তবু কোনো উত্তর দিই নি।

পাখাটা হারাবার পর যেন সকলেরই গরম বোধ আরও বেড়ে গেল। সবাই ছটফট করছে আর

ঘন ঘন জল খাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে নেমেই ফ্লাস্কে জল ভরে আনতে হয়। একটা স্টেশনে আমি জল ভরতে নামলাম।

জলের কলটা অনেক দূরে। সেখানে আবার ভিড়। ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ যেন চুম্বকে আমার চোখ একদৃষ্টে আকৃষ্ট হলো।

একটা কামরা থেকে একটি বাঙালী পরিবার নামছে প্রচুর মালপত্র নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ের হাতে একটি পাখা, অবিকল আমার দিদির পাখাটার মতন। আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। এ কি করে সম্ভব? ঠিক এক রকমের দুটি পাখা? এ পর্যন্ত দিদির ঐ জাপানী হাত পাখাটার মতন দ্বিতীয় কোনো পাখা আমরা দেখিনি। অবশ্য জাপানে নিশ্চয়ই ওরকম একটাই পাখা তৈরি হয়নি। আর কেউ জাপান থেকে ওরকম আর একটা পাখা আনতেও পারে।

কিংবা এমনও তো হতে পারে, আমার হাত থেকে পাখাটা উড়ে গিয়ে ট্রেনের অন্য কোনো কামরায় ঢুকে গেছে। এরকম তো হয়ই। অনেক সময় যেমন ছেঁড়া কাগজ কিংবা চীনে বাদামের খোসা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে।

পাখাটা ফেরৎ চাইবো? দিদির অতি প্রিয় জিনিস। কিন্তু যদি ওটা আমাদের না হয়? যদি সত্যিই ওটা ওদেরই পাখা হয়, তাহলে আমাকে কী ভাববে? নিশ্চয়ই ভাববে একটা জোচ্চোর।

তখন আমি মনে মনে কয়েকটা সংলাপ তৈরি করে নিতে লাগলাম। যদি গিয়ে বলি, দেখুন, এ পাখাটা কি আপনাদের? আমাদেরও এরকম একটা পাখা ছিল। না, না, এভাবে ঠিক বলা যায় না।

কিংবা যদি বলি, বাঃ পাখাটা খুব সন্দর তো! কোথা থেকে কিনেছেন?

তা হলেই নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো এটা কিনিনি! জানালা দিয়ে উড়ে এসেছে।

তারপরই আমি হেসে বলব, ওটা আসলে আমাদের। বিশ্বাস না হয়, আমাদের কামরায় চলুন, সবাই সাক্ষী দেবে!

এ পর্যন্ত তো ঠিক করা হলো। কিন্তু একটা অচেনা মেয়ের সামনে গিয়ে হঠাৎ তার হাতের পাখাটার প্রশংসা করার জন্য যতখানি সাহস থাকা দরকার, আমার তা নেই। দারুণ লজ্জা করতে লাগলো।

এই রে, মেয়েটি যে এবার পাখাটা গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার নিশ্চয়ই ব্যাগে ভরে রাখবে। তারপর তো আর কিছুই করা যাবে না।

ওদের দিকে দু'এক পা এগিয়েছি, এমন সময় মেয়েটির মা মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুই ঐ পাখাটা এখনো ফেলিস নি! কার না কার পাখা, পুরানো একটা জিনিস—

মেয়েটি বলল, না, আমি এটা রাখবো!

কক্ষনো না! পরের জিনিস ওরকম নিতে নেই। রাস্তায় ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস কিছুতেই বাড়িতে ঢোকাবি না। ফেলে দে, ফেলে দে!

আমি হা-হা করে ওঠার আগেই মেয়েটি রাগ করে পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্ল্যাটফরম পেরিয়ে সেটি গিয়ে পড়ল লাইনের কাছে!

আমি স্তম্ভিত। সত্যিই ওটা আমাদের পাখা। এত কাছে এসেও ফেরৎ পেলাম না। ট্রেন দাঁড়ানো অবস্থায় লাইন থেকে কোনো জিনিস তোলা যায় না। তাছাড়া ওখানে কত লোক কত ময়লা জিনিস ফেলে—

তবু একবার চেষ্টা করবো ভেবেছিলাম। এমন সময় ফুর্-র-র করে গার্ডের বাঁশী বেজে উঠলো। ট্রেন নড়েচড়ে উঠলো। আমি দৌড়ে নিজেদের কামরার দিকে চলে এলাম।

ফিরে এসে, উত্তেজনা ও হতাশা মিশিয়ে ঘটনাটা বললাম সবাইকে। আমি যদি অতটা লাজুক হয়ে না গিয়ে মেয়েটিকে একটু আগে বলতাম, তাহলে পাখাটা যে ফেরৎ পাওয়া যেত তাও জানালাম। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো না। এমন কি দিদি পর্যন্ত বললো, উফ্ নীলুটা কী গুলবাজ হয়েছে! বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই যে বলে!

বাইশ

ভেবেছিলাম চার পাঁচ দিন থাকবো, কিন্তু দু'দিন পরেই মন ছটফটিয়ে উঠলো। জায়গাটা সুন্দর, আবহাওয়া ভালো, খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু, তবু মন টিকলো না। থাকার জায়গা পেয়েছিলাম শহর চাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে, একটা টিলার ওপর সুদৃশ্য ডাকবাংলোয়, ঘরটায় এতগুলি জানলা যে, পুরো ঘরটাই কাঁচের তৈরি বলে মনে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, চোখে আলো পড়ায় ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরবেলা।পর পর দু'দিন পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যোদয় দেখে ফেললাম। সুতরাং জায়গাটাকে আদর্শই বলা উচিত, এরকম নিভৃত নিরালাই চেয়েছিলাম। অথচ, এক-এক সময় নির্জনতায় এসেই মানুষের সঙ্গের জন্য মন ছটফট করে। জল যেমন জলের দিকেই গড়িয়ে যায়, তেমনি আমার ইচ্ছে হলো মানুষের কাছে যেতে। পাহাড়, আকাশ, সূর্যোদয়—এই সব প্রকৃতি ফ্রকৃতি আমার কাছে অসহ্য মনে হলো হঠাৎ।

সকালেই ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে ডাকবাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম

জায়গাটি উত্তর প্রদেশের একটি পাহাড়ী শহর। শহরের মধ্যে কয়েকটি হোটেল আছে। ভ্রমণকারী আসে পাহাড়ের ওপর একটি বিখ্যাত প্রস্রবণ দেখতে, সেটির জল নাকি হজমের পক্ষে পরম উপকারী। অর্থাৎ সৌন্দর্য পিপাসুদের চেয়ে পেটরোগাদের ভিড়ই বেশী।

ট্রেন নেই, বাসে যাতায়াত। দিনে দুটি মাত্র বাস। সকালের বাসটি সরকারী—আগে থেকে টিকিট কেটে রাখতে হয়। আমি হাজির হয়ে দেখলুম বাসের টিকিট আগেই শেষ হয়ে গেছে। এর পরের বাস বিকেলে, কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আর আমার নেই। একবার যখন জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, আর ফিরে যাওয়া যায় না।

বাস ডিপোর টিকিটবাবুটিকে আমি কাকুতিমিনতি করতে লাগলাম একটা টিকিটের জন্য। কোনো উপায় নেই।?

একটু বাদে দয়াপরবশ হয়ে টিকিটবাবুটি বললেন, বাস ছেড়ে যাবার কথা আটটায়, কিন্তু কিছু একটা যান্ত্রিক গোলোযোগের জন্য ঘন্টাখানেক দেরি হবে সেদিন। অন্য সব যাত্রীরাই এসে গেছে, শুধু রামশরণ গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক তখনও পৌঁছোন নি। তিনি যদি শেষ পর্যন্ত না আসেন, তা হলে সেই টিকিটটি আমাকে দেওয়া যেতে পারে। অপেক্ষা করতে হবে।

আমি মনে মনে রাম নাম জপ করতে লাগলাম। অর্থাৎ—হে রামচন্দ্রজী, তোমার দয়ায় যেন তোমার শরণকারী সত্যিই গুপ্ত হয়ে যান। আজ যেন না আসে।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না, তাঁর টিকিটটা পেয়ে ধন্য হয়ে আমি বাসে উঠেই বই খুলে বসলাম। একটু একটু শীত, গায়ে রোদ্দুর পড়ায় বেশ আরাম লাগছে। বাসের অন্য যাত্রীরা বাস ছাড়তে দেরি হওয়ায় অধৈর্য হয়ে নেমে গিয়ে পাশের দোকানে চা আর পেঁয়াজী ভাজা খাচ্ছে।

এক সময় ড্রাইভার এসে ভেঁপু বাজালো। চায়ের দোকান থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এলো যাত্রীরা। এক মহিলার গলা শোনা গেল, বাবারে বাবা, এতক্ষণে বাস ছাড়ার সময় হলো! এই পোড়ারমুখোদের একটুও সময়জ্ঞান নেই!

বাংলা কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দুটি মহিলা, দুজন প্রৌঢ়, তিনটি বাচ্চা মিলিয়ে একটি ছোটখাটো দল। বাসটা কলরবমুখর হয়ে উঠলো। বেশ কিছু দিন পরে বাংলা কথা শুনে আমার আরাম হলো খুব। বাইরে বেরিয়ে অনবরত ভাঙা ইংরেজী আর ভাঙা বাংলা বলতে বলতে ঠোঁট ক্ষয়ে যায়!

বাস ছাড়লো। আমি বইটা মুড়ে রাখলাম। চলন্ত বাসে বই পড়ার চেয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। আমার পাশে বসেছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, নিখুঁত সুট-টাই পরা, মুখের দাড়ি একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হয় খুব গম্ভীর।

সামনের সীটের যুগলকে দেখেই বোঝা যায় দম্পতি। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে মেয়েটি পরেছে স্ল্যাকস ও গেঞ্জি ধরনের জামা, বেশ আধুনিকা। মেয়েটির শরীরের গড়ন এমনই

চমৎকার যে, ঐ পোশাকে তাকে বেশ মানিয়েছে। আমি অবশ্য মেয়েটির প্রতি একবারের বেশী দুবার তাকাইনি। নর্ববিবাহিত নারী যতই রূপসী হোক, তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আমার রীতিবিরুদ্ধ : তার স্বামীটিও পুরোপুরি দিশি সাহেব, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোনো বড় কোম্পানির মাঝারি অফিসার।

বাঙালী দলটি থেকে এক মহিলা বললেন, আমাদের হোটেলের ম্যানেজারটা....কী মোটা...ঠিক যেন কুমড়োপটাস....

ওদের দলের সবাই মিলে হেসে উঠলো। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা কিছুই বুঝলো না, তারা আধুনিক প্রথা অনুযায়ী আরও গম্ভীর হয়ে রইলো।

আর এক মহিলা বললেন, দ্যাখ্যো, দ্যাখো, আমাদের হোটেলের সেই দুজন সেই যে কপোত॥কপোতী॥এই বাসেই উঠেছে।

—মেয়েটা কী বিচ্ছিরি জামা পরেছে! বেহায়া!

—অসভ্য! দেখছিলে না সবার চোখের সামনে কী কাণ্ড করছিল! আর কারুর যেন নতুন বিয়ে হয় না!

বুঝলাম, আমার সামনের নব-দম্পতি সম্পর্কেই এই সব মন্তব্য ছোঁড়া হচ্ছে। আমার লজ্জা করতে লাগলো। ওরা বুঝতে পারছে না যদিও, তা হলেও.....। বাঙালী দলটার মধ্যেই তো বাচ্চা ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা তো বুঝছে।

—বাসের আর কেউ বাঙালী নেই, না?

—কোথায় বাঙালী? সব তো অ্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই ইডলি ধোসা, নয়তো বাঁধাকপি আর নয়তো যায়ে গা খায়ে গা।

আমার একটু দুঃখ হলো। আমাকে দেখে বাঙালী বলে চেনা যায় না? না হয় দু'দিন দাড়ি কামাইনি। সেই মুহূর্তে অবশ্য আমার আর বাঙালী সাজবার ইচ্ছেও হলো না। আমি মুখখানাকে যত-সম্ভব হিন্দী-হিন্দী করে রাখলাম।

বাসে আর সব যাত্রীই হয় একলা বা দোকলা, ওরাই শুধু একটি দল—সুতরাং আর সবাই নীরব, ওর নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় অনবরত কথা বলে যেতে লাগলো।

বাঙালী এমনিতেই একটু পরচর্চা বা পরের সমলোচনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই দলটির দেখলাম পরের সমালোচনার জিভ একেবারে ধার দেওয়া। সমালোচনার বেশী লক্ষ্য ঐ স্ল্যাকস ও গেঞ্জিপরা যুবতীটি!

—এরা কি শাড়ি পরতে ভুলে গেছে? নতুন বউ, ঘোমটা দিয়ে শাড়ী পরলে কত ভালো দেখায়।

—পেন্টু পরে মেম সাজা হয়েছে! যেন হিন্দী সিনেমার হিরোইন। এবার ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেই হয়।

—বিয়ে হয়েছে কিনা তাই দেখো! আমার তো মনে হয়....

—যা আদেখলাপনা করছিল! যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে একেবারে?

—মেয়েমানুষ কখনো গেঞ্জি পরে বাইরে বেরোয়! ঠিক যেন বিলিতি কুকুরের মতন দেখাচ্ছে!

আমি বুঝলাম, এটা শুধু সমালোচনা নয়, ঈর্ষা। যুবতীটির শরীরের যা গড়ন, যে-কোনো পোশাকেই ওকে মানাবে। সেদিক থেকে বাঙালী মহিলা দুজনের শরীর..ওঁরা নিশ্চয়ই ঝরণার জল খেয়ে পেটের রোগ সারাতে এসেছিলেন।

—আর বরটাকেও তো দেখতে শেয়ালের মতন। কী রকম ছুঁচোলো গোঁপ রেখেছে!

—দেখিস যেন হঠাৎ বৃষ্টি না নামে?

—বৃষ্টি? কেন?

—শেয়াল কুকুরের বিয়ে হলে রোদ্দুরের মধ্যেই বৃষ্টি নামে না?

হাসির ধুম পড়ে গেল। আমার মুখটা অবশ্য তেতো লাগছিল এরকম রসিকতায়। অপরের চেহারা নিয়ে রসিকতা করার মধ্যে কোনো রুচি নেই। এই দলটা কেন বাঙালী হলো গেল? এখন

বাংলা ভাষাই আমার বিশ্রী লাগছে!

ওরা হঠাৎ নামকরণের খেলায় মেতে উঠলো। নব-দম্পতির নাম শেয়াল-কুকুর দেওয়ার পর এক মাদ্রাজী ভদ্রলোককে আখ্যা দিল ভুষন্ডীকাক, আর একজনকে বললো কেল্লেমানিক। মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক উত্তর প্রদেশীয় মহিলাকে বললো চিটে গুড়ের হাঁড়ি, বাসের কণ্ডাকটরকে বললো ল্যাগব্যাগ শিং...

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলাম। যে-ভাবে ওঁরা এগুচ্ছেন, তাতে আমারও নাম দিয়ে ছাড়বেন মনে হচ্ছে। কী নাম হবে আমার?

ক্রমে আমার পাশের পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লেন ওঁরা সামান্য তর্ক-বিতর্কের পর তাঁর নাম ঠিক হলো হলোবেড়াল। এবার আমার পালা। আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। উদাসীন ভাবে। কান খাড়া।

প্রথমে এক মহিলা বললেন, ও লোকটাকে তো একেবারে গলাকাটা সেপাইয়ের মতো দেখতে।

আর একজন মহিলা বললেন, যাঃ, হোঁদল কুতকুত!

—না, না, গোমড়ামুখো রামগড়ুরের ছানা!

—না রে, মামদোভুত!

শেষ পর্যন্ত রামগড়ুরের ছানাই সাব্যস্ত হলো। খুব খারাপ নয়, অন্তত অন্যগুলোর চেয়ে ভালো। কিন্তু গলা-কাটা সেপাই কেন বললো একজন? আমার তো দিব্যি গলা রয়েছে। তার ওপর আস্তো একটা মাথা!

ঘন্টা দেড়েক বাদে বাস থাকলো একটা ছোট জায়গায়। চা-পানের বিরতি। সবাই নামলো। এখানেও একটি চায়ের দোকনে টাটকা জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

আমি বাঙালী দলটির ধারে কাছেও গেলাম না। আমার হাতের বইটি ছিল বাংলা। সেটা অনেক আগেই মুড়ে ব্যাগের মধ্যে লকিয়ে রেখেছি। দোকানদারের সঙ্গে হিন্দী বলছি সঠিক ভাবে।

চায়ের দোকানেও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বসলেন আমার পাশের চেয়ারে। নীরবতা ভেঙে তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় যাবো।

আমি বললাম, কলকাতায়।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বললেন, কলকাতায় বাগড়ি মার্কেটে তাঁর আঁয়নার দোকান আছে। তার বাড়ি ভবানীপুরে।

আমি সন্দিগ্ধভাবে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি এবার মৃদু হেসে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, আমি আঠাশ বছর ধরে কলকাতায় আছি। আমাকে কি সত্যিই হলো বেড়ালের মতন দেখতে?

আমি উত্তর দেবার সময় পেলাম না। পাশের টেবিল থেকে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি ঝুঁকে এসে, একটা চোখ টিপে ফিসফিস করে বাংলায় বললেন, আমিও কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করি। আমার মেয়ে দু'বছর আগে হায়ার সেকেণ্ডারিতে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল। আপনিও তো বাঙালী, দেখলেই বোঝা যায়।

আমি মাটির দিকে তাকালাম। বেশ পাথুরে শক্ত মাটি। এখান থেকে অযোধ্যা খুব দূরে নয়। সেই অযোধ্যায় সীতা একবার ধরণী দ্বিধা হও বলতেই মা ধরিত্রী তাঁকে কোল দিয়েছিলেন। মা ধরিত্রী কি আমার আবেদন শুনবেন?

তেইশ

কলকাতা শহরে সারা রাত কোথায় সিগারেটের দোকান খোলা থাকে? কিংবা, রাত তিনটের সময় হঠাৎ নিজের ছবি তোলবার ইচ্ছে হলে কোথায় চটপট ক্যামেরাম্যান পাওয়া যায়? দুটোরই উত্তর, শ্মশানে।

আমি মাঝে মাঝে শ্মশানে বেড়াতে যাই, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। বেড়াবার পক্ষে কলকাতার যে-কোনো শ্মশানই খুব চমৎকার জায়গা, বিশেষত মাঝ রাত্রে। রাত্তিরবেলায় কোনো কিছুই কুশ্রী থাকে না, কলকাতার রাস্তাঘাট, সমস্ত বাড়িই সুন্দর দেখায়, এমনকি শ্মশানও!

শ্মশানে গিয়ে আমি অনেকবার ঘুমিয়েও পড়েছি, চিরনিদ্রায় নয় অবশ্য। আর ভোরের দিকে গরম গরম রাধাবল্লভী, জিলিপি আর চা-এর স্বাদ পেলে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

ভাস্করের দাদার খালি ফ্ল্যাটে আমরা সারা রাত্তিরের আড্ডায় বসেছিলাম। খাদ্য, পানীয় এবং তাস—সবই ছিল, শুধু সিগারেট ফুরিয়ে গেল হঠাৎ এক সময়। তখন রাত মাত্র আড়াইটে। সিগারেট সঙ্গে থাকলে অনেক সময় না খেলেও চলে কিন্তু সিগারেট যদি না থাকে তাহলে মনে হয় এক্ষুনি একটা সিগারেট না পেলে বেঁচে থাকার আর কোনো মানেই হয় না।

মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে একটা পানওয়ালা মাটির নীচে ঘুমোয়, তার কাছে রাত দুটোতেই সিগারেট পেয়েছি এক এক দিন। আর দোকনটা ওপরে, কিন্তু যেখানে সে ঘুমোয় সে জায়গাটা প্রায় মাটির নীচে। তার দোকানের টিনের ঝাঁপে কয়েকবার চাপড় মারলেই সে জেড়ে ওঠে। সেখানেই একবার চেষ্টা করা যাক।

সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। এই সময় মাঝ রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কোনো অসুবিধে নেই আমরা কয়েকজন বন্ধু পথের রাজার মতন সদর্পে হেঁটে পৌঁছোলাম মেডিক্যাল কলেজের সামনে। লোকটিকে ডেকে তোলাও হলো, কিন্তু সে ভেতর থেকেই উত্তর দিল, সিগারেট নেই।

তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে দিয়ে দোকান খোলালাম। সত্যিই, আমরা যা সিগারেট খাই, চার্মিনার বা ভাজির, তা ওর নেই, আমি সিগারেটের ব্যাপারে চট করে আনুগত্য বদলাই না। তাই বন্ধুদের বললাম, চল, শ্মশানে যাই।

চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ার রাত। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথে অনেক লোকজন ঘুমুচ্ছে, এরা সকলেই দীন দুঃখী নয় জানি, তবু তাদের ঘুমন্ত মুখগুলি দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে কোনো অশান্তি নেই।

নিমতলা শ্মশানে এসে দেখি বেশ জম-জমাট ব্যাপার, প্রচুর লোকজন, আরো, এবং মাত্র সাতজন ছাড়া আর সকলেই জেগে আছে। সেই সাতজন আর কখনো জাগবে না। ভাস্কর বললো, এবার মরার সীজন বেশ ভালোই পড়েছে মনে হচ্ছে। এত রাত্তিরেও সাতটা মড়া।

আমরাও স্বীকার করলুম, মড়ার ব্যবসাটা এখানে ভালোই চলছে। এখানকার লোকজন নিশ্চয়ই তাদের পেশায় সঙ্কট বিষয়ে খবরের কাগজে চিঠি লিখবে না।

সিগারেট পাওয়া গেল, কিন্তু তক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে করলো না। এবার অনেকদিন বাদে আসা হলো, চেনাশুনো অনেককে দেখতে পেলুম না। সেই বাচ্চা সাধুটা নেই। তার বয়েস ছিল মাত্র বারো তেরো, দারুণ রাগী সাধু, সকলের সঙ্গে খুব ধমকে ধমকে কথা বলতো।

আর গাঁজা টানতো কী, তিন টানে কল্কে ফাঁক। তবে তার ছিল মিষ্টি খাওয়ার খুব লোভ। একদিন আমরা এক ঠোঙা জিলিপি খেতে খেতে ওকেও একটা দিয়েছিলাম। ও চকচকে চোখে তাকিয়ে ছিল ঠোঙাটার দিকে। সেই জন্য ওকে আর একটা জিলিপি দিতেই ও আস্ত সেটাকে কপাৎ করে মুখে পুরে ফেললো। তারপর তাকে পুরো ঠোঙাটাই দিয়ে দিলাম। ছেলেটি বিহারী, আরা জেলায় বাড়ি। বারো বছরের একটি ছেলে সাধু হয়ে গঙ্গার ধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে, এই দৃশ্যটা দারুণ মজার। তাকে নিয়ে আমাদের বেশ সময় কেটে যেত।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সেই পিওনটিকেও দেখলাম না। ছোট্টখাট্টো চেহারা, ধুতির ওপর নীল শার্ট, হাতে একটা ছাতা-এই ভাবেই তাকে বরাবর দেখেছি। তার কাজ ছিল বিভিন্ন সাধুর আখড়ায় গাঁজার ছিলিম সেজে দেওয়া। সে যে নিজে খুব গাঁজাখোর ছিল তা নয়, দু'এক টান দিত মাত্র, কিন্তু সাধু-সেবার দিকেই ছিল তার ঝোঁক। তার সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম, সে রাইটার্স বিল্ডিংসের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের পিওনের কাজ করে। তবে প্রত্যেক রাত শ্মশানে কাটিয়েও যে সে কি করে আবার

দিনের বেলায় অফিস করে, সেটাই ছিল এক রহস্য। এক একদিন সে গান ধরতো, তার গানের গলাটি চমৎকার। মধ্য রাত্রিতে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে তার সেই গান গাওয়ার দৃশ্য দেখে মনে হতো, সে তখন আর সামান্য একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নয়, সে একজন শিল্পী, একজন মহান মানুষ।

তার বদলে এখন নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন সাধু আসে। শ্মশানে কিছুই থেমে থাকে না। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটা আখড়ায় বসলাম একটু করে। আমরা একদল নাস্তিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ আমাদের ভালো লাগে।

কাঠগোলার পাশে একটা বস্তিঘরে সাইনবোর্ড দেয়া আছে, "এখানে দিবারাত্রি ফটো তোলা হয়।" এই সেই মড়ার ক্যামেরাম্যান। একেও আমরা চিনি। অনেকের শখ হয় শ্মশানে একে মৃতদেহের ছবি তোলবার। সেই উদ্ভট শখ মেটাবার জন্য এই লোকটির চব্বিশ ঘন্টা বাড়িতে থাকতে হয়।

ভাস্কর সেই সাইববোডটার দিকে তাকিয়ে বললো, একটা ছবি তোলালে মন্দ হয় না। লোকটাকে ডাকবি নাকি? আমাদের গ্রুফ ফটো তুলে দেবে—কে কবে মরে যাই ঠিক তো নেই!

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলাম। একটা কিছু মজা তো হবেই। রোকটার ঘরের দরজার ধাক্কা দিলাম। ভেতর থেকে ঘঙর ঘঙর কাশির শব্দ ভেসে এলো।

আমরা আবার ডাকলুম, ও দাদু, দরজা খুলুন।

—ক্যা?

—ছবি তোলাবো, উঠুন!

খাটের মচ্‌মচ্‌ শব্দ, আবার ঘঙর ঘঙর কাশি। তারপর দরজা খুলে যিনি উঁকি মারলেন, তাঁর বয়েস ষাট্ থেকে নব্বইয়ের মধ্যে যে-কোনো একটা কিছু হবে। খালি গা, সবকটা পাঁজরা গোণা যায়, গালটা এমন তোরড়ানো যেন মনে হয় দু'দিকে দুটো গর্ত। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ডেডবডি কোথায়? কোন ঘাটে!

ভাস্কর বলল, ডেডবডি নেই। এই তো আমরাই কজন আছি।

তিনি বললেন, ঠাট্টা! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে এরকম ঠাট্টা কারই বা ভালো লাগে! তিনি একটা অতি অসভ্য গালাগালি দিলেন।

ভাস্কর বললো, রাগ করছেন কেন? আমরা ঠাট্টা করছি না, অ্যাডভান্স পয়সা দেবো, বুঝলেন না কাজ সেরে রাখছি।

—তার মানেটা কী হলো?

—মানে, মরার পর ছবি তোলার চেয়ে আগেই কাজটা সেরে রাখা ভালো নয়?

—এক কপি সাড়ে সাত টাকা পড়বে!

—তাই দেবো।

বুড়ো লোকটি ক্যামেরা বার করলেন। সেটা একটা দেখবার মতন জিনিস। এরকম ক্যামেরা আজকাল কুচিৎ চোখে পড়ে। আগেকার সেই ফোল্ডিং ক্যামেরা, স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করানো, ছবি তোলা হয় প্লেটে, ক্যামেরাম্যান নিজের মাথা ও ক্যামেরা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে বলে, রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি!

ভদ্রলোক ক্যামেরা সাজাচ্ছেন, এমন সময় ঠুং করে একটা শব্দ হলো। ক্যামেরার লেন্সের ঢাকনাটা পড়ে গেল মাটিতে। তিনি সেটা খুঁজতে লাগলেন। জিনিসটা কিন্তু তাঁর পায়ের কাছেই পড়ে আছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন। লোকটি নিশ্চয়ই রাতকানা। এই লোক আমাদের ছবি তুলবে!

ভাস্কর বললো, দাদা, আমরা কী দাঁড়িয়ে থাকবো, না শুয়ে পড়বো?

—সে তোমাদের ইচ্ছে।

—না, ভাবছিলাম যে আপনার তো মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছবি তোলার অভ্যেস নেই, সবাই শুয়ে শুয়ে ছবি তোলায়....তাই, বলেন তো আমরা চারজন পাশাপাশি শুয়ে পড়তে পারি!

—দেখো, মিত্যু নিয়ে অমন মস্করা করো না। যেদিন আসবে, টেরটিও পাবে না। কত দেখলাম.....আঃ সে ব্যাটাচ্ছেলে আবার কোথায় গেল?

—কে?

—লেন্সের ঢাকনাটা!

ছবি তোলা শেষ হয়ে যাবার পর নাম ঠিকানা ও টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ভাস্কর বললো, দাদু, আপনার নিজের ছবি তোলা আছে তো? একটা কিছু হয়ে গেলে তখন আপনার ছবিটা কে তুলবে?

ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গেলেন এ কথায়। দাঁত খিঁচুনি দিয়ে বললেন, ফকড়ামি হচ্ছে? অ্যাঁ, আমার সঙ্গে ফকড়ামি?

আমরা চোঁচা দৌড় মারলাম।

ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ফিরলে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো গঙ্গায় একটু সাঁতার কেটে যেতে। অন্যদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ বাকি আছে। তীর্থস্থানে এলে যেমন মুর্তি দর্শন না করে কেউ ফেরে না তেমনি শ্মশানে এসে মৃতদেহগুলি একবার দেখে যেতে হয়।

চারটি চিতা জ্বলতে শুরু করেছে, তিনটি মৃতদেহ তখনো অপেক্ষমাণ। ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় এসে আমরা থমকে গেলাম। খাটিয়ার ওপর একজন শুয়ে আছে, ঠিক যেন আমারই কৈশোরের চেহারা। ষোলো কিংবা সতেরো বছর বয়েস, কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে এসেছে। তার চোখ বোজা, মুখে কোনো বিকৃতি নেই, মৃত্যুর কোনো চিহ্নই নেই। ছেলেটি সুশ্রী কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ঐ বয়েসের একটা আলাদা রূপ থাকে।

আমি ভাস্করের হাত চেপে ধরে বললাম, ঠিক ঐ বয়েসে আমি একবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। তাই হঠাৎ মনে হলো, বুঝলি, যেন আমিই শুয়ে আছি ওখানে।

ভাস্কর বললো, এ ছেলেটিও বোধ আত্মহত্যা করেছে। অসুখে ভুগেছে বলে তো মনে হয় না।

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। ছেলেটির খাটিয়া ঘিরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেহারার নারী পুরুষ বসে আছেন, নিঃশব্দ। শোকের একটা গাম্ভীর্য আছে, তাতে বিঘ্ন ঘটানো যায় না।

শরৎ বললো, ঐ বয়েসে আমি প্রথম একা লক্ষ্ণৌতে দিদির কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেরকম আনন্দ আর জীবনে কখনো পাইনি।

ছেলেটি এই সদ্য যৌবনে কেন চলে গেল? সে কথা জানবার জন্য বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারছি না কারুকে। তার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতেও পারছি না। সে অসম্ভব রূপবান হয়ে রাজকুমারের মতন শুয়ে আছে।

এবার বোধ হয় ছেলেটিকে তোলা হবে, তার খাটের পাশে কয়েকজন নারী পুরুষ হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেলেন। আমি দেখলাম ভাস্করও কাঁদছে। তার হাত ধরে বললাম, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চল্।

ভাস্কর উত্তর দিল না। শরৎ বললো, আর একটু দাঁড়া। শরৎ আর আশুও রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরলো। তখন আমিও আর থাকতে পারলাম না। দারুণ কান্না এসে গেল।

একটা অচেনা ছেলের মৃত্যুর জন্য আমরা কাঁদছি কেন? আমাদের মতন কঠিনহৃদয় পুরুষের চোখে জল? পরে বুঝলাম, আমরা কাঁদছিলাম আমাদের প্রত্যেকের কৈশোরের কথা ভেবে। যে কৈশোর আমরা আর কখনো ফিরে পাবো না!

চব্বিশ

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানো আমার একটি নিত্য বিলাসিতা। কোনোদিনই প্রায় এগারোটার আগে ফিরি না। সুতরাং বারান্দায় এসে দাঁড়াতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা বেজে যায়।

বাড়ির সামনেই ব্রীজ। অত রাত্রে বিশাল ব্রীজটির দি ক তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। এই সময়টা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, শুধু কিছু গাড়ি যায় অতি দ্রু ত তিতে, আর কয়েকটা লোক এমনভাবে হাঁটে, যাতে মনে হয় ওরা সারা রাত ধরেই হাঁটবে ঠিক করেছে। চলন্ত গাড়ির জানলায় আমি প্রত্যেকদিনই কোনো চেনা লোক খুঁজি, একদিনও পাই না। ফাঁকা দোতলা বাসের ওপরে দু'তিনটি মাত্র বসে থাকে—এই দৃশ্যটা খুব করুণ লাগে। দোতলা বাস ভিড়ে ভর্তি না থাকলেই মনে হয় রোগা হয়ে গেছে। কোনো অসুখ করেছে বুঝি।

এরকমই একদিন রাত বারোটার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো ব্রীজের একটি বাতি স্তম্ভেরগায়ে একটা মই লাগানো। দৃশ্যটি দেখে কীরকম যেন অস্বস্তি লাগে। ঠিক যেন মানাচ্ছে না। এটা দেখে কী যেন মনে পড়ার কথা।

মাথার মধ্যে চিনচিন করতে লাগলো। মই, মই, ল্যাম্পপোস্টে মই, কি যেন হয়েছিল একবার?

তারপরেই মনে পড়লো। এতে সাংঘাতিক ব্যাপার। আবার মই? মাস কয়েক আগে আমাদের ঠিক বাড়ির পাশেই ল্যাম্পপোস্টে এরকম একটা মই লাগানো ছিল। রাত্রে একবার দেখেছিলাম আর বিশেষ কিছু খেয়াল করিনি। সেই দিন রাত্তিরেই আমার ঘর থেকে অনেক কিছু চুরি হয়ে যায়। রেডিও, ঘড়ি, জামা-কাপড়। রেডিও, ঘড়ি ফড়ির জন্য খুব একটা দুঃখ হয়নি, ওসব জিনিস থাকলে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই, দিব্যি জীবন চলে যায়। কিন্তু একটা নীল ডোরাকাটা জামা ছিল আমার খুব প্রিয়। জামা-প্যান্টের মধ্যে একএকটার প্রতি হঠাৎ ভালোবাসা জন্মে যায়। আমার সেই প্রিয় জামাটা কোনো এক চোর-জোচ্চর গায়ে দেবে ভেবেই আমার রাগ হচ্ছিল। আর দশটা জামা কিনলে ও দুঃখ ঘুচবে না।

সেবার চোর যে কেন আরও কিছু দেন নি, সেটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। চোরকে কিছুই কষ্ট করতে হয়নি। ল্যাম্পপোস্টের মইটি সরিয়ে এনে আমার বারান্দায় লাগিয়েছে। তারপর তরতর করে উঠে এসেছে। গ্রীষ্মকালে তিন তলায় দরজা-জানলা সবাই খুলে শোয়। চোর বারবার আনাগোনা করতে পারতো ইচ্ছে করলে। নিশ্চয়ই কোনো পাকা চোর সেদিন এ পাড়ায় আসে নি, কোনো শৌখিন চোর বা বাচ্চা ছেলের কাজ। হাতের কাছে ওরকম একটা মই পেলে যে কেউ চোর হয়ে উঠতে পারে।

আজ এই মইটা তো এক্ষুনি সরানো দরকার।

কলকাতার শহরে লোকের বাড়িতে মই থাকে না। অন্তত আমি কোথাও দেখিনি। ঐ ধরনের কাজ টুল দিয়েই সারা হয়। একবার এক বিয়ে বাড়িতে খুব উঁচুতে একটা বাল্‌ব লাগাতে গিয়ে আমি একটা জলচৌকির ওপর টুল বসিয়ে তার ওপর উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম। এখন এই মইটা দেখে সেই কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আরও রাগ বাড়লো।

প্রথমে ভাবলাম, নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে মইটা কোথাও সরিয়ে রেখে আসবো, কিন্তু পরে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। রাত বারোটার সময় আমি একটি মই কাঁধে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এ দৃশ্যটা অতি যাচ্ছেতাই! এ কখনো আমাকে মানায়! তাছাড়া এত বড় মই আমি একা বইতে পারবো কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। যদিই বা পারি, মইটা নিয়ে রাখবো কোথায়, যার সামনে রাখবো, সে বাড়ির কেউ যদি সেই সময় দেখে ফেলে? তাহলে আমাকেই তো চোর ভাববে! এক হয়, ওটাকে রেল লাইনের ‍্পর ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারপর যদি কোনো ট্রেন দুর্ঘটনা হয়, সেজন্য আমাকেই দায়ী হতে হবে।

অথচ, মইটা ওখানে রাখা বিপজ্জনক। ছিঁচকে চোররা আমার বাড়ি চিনে গেছে। তারা তো আর জানে না যে আমি আর রেডিও বা ঘড়ি কিনিনি! তারা যদি ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে আসে, কিছু না কিছু পাবেই।

মাথায় একটা অন্য বুদ্ধি এলো। এরকম দুতলা তিনতলা সমান মই কলকাতায় শুধু একটি মাত্র কোম্পানিরই থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। মইটা ল্যাগানোও রয়েছে বিজলি বাতির স্তম্ভে। পুরানো টেলিফোন গাইডের মলাটে দেখেছি, যে কোনো সময়ে ঐ কোম্পানিতে খবর দেবার জন্য একটা আলাদা নম্বর আছে। টেলিফোনে সেই নম্বরটা ডায়াল করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দুটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। একবারের চেষ্টাতেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল। এবং ক্রিং ক্রিং করে বাজাতেই একজন রিসিভার তুলে বললেন, ইয়েস? এত রাত্রে সত্যি সত্যি একজন টেলিফোনের সামনে জেগে বসে আছেন।

এই সার্থকতায় আমি রীতিমতন মুগ্ধ হয়ে গেলুম। তাহলে আর ভয় নেই। এবার সমস্যা আছে ভাষার। এই আগে আমি বিদ্যুৎ কোম্পানিতে একবার ফোন করায় এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক ধরেছিলেন। তখন সব কথা ইংরেজিতে বলতে হয়। এখন এত সব কথা কি আমি ইংরেজিতে বলতে পারবো?

আমি বিনীতভাবে প্রথমে ইংরেজিতেই বললাম, দেখুন এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি কি বাঙালী?

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ইংরেজিতে জবাব দিলেন, কেন, আমি বাঙালী না অবাঙালী, সেটা না জানলে বুঝি আপনার ঘুম হচ্ছে না? শুধু এটা জানবার জন্যই।

আমি বললাম, দাঁড়ান, দাঁড়ান, টেলিফোনটা রাখবেন না, রাখবেন না! অন্য কথা আছে মানে আমি বলছিলাম, আপনি বাঙালী হলে বাঙলায় কথা বলতে পারি, নইলে আমার কথাটা ইংরেজিতে বলতে হবে।

—আপনি ইচ্ছে করলে ফ্রেঞ্চ-জার্মানেও বলতে পারেন!

ততক্ষণে বুঝে গেছি, ইনি বাঙালী না হয়ে যান না। সুতরাং বাঙলাতেই শুরু করলাম।

আরও বিনীতভাবে বললাম, দেখুন, হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি, কিন্তু আমার সমস্যা একটা মই সম্পর্কে।

—কি বললেন, মুড়ি?

—না, মুড়ি নয়, মুড়ি নয়, মই।

—মুই? তার মানে কি?

—মই-ও নয়। আমি বলছি মই, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে ল্যাডার। আপনি সাপ লুডো খেলেছেন কখনো, তাতে অনেক ঐ জিনিস থাকে।

—ও, মই! তাই বলুন? তা মইয়ের কথা আমাকে কেন? আপনি কি এতরাত্রে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চান?

রাত জেগে টেলিফোনের সামনে বসে থাকা নিশ্চয়ই কিছু সুখের কাজ নয়। ভদ্রলোক বিরক্ত হতেই পারেন। তাই আবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, মইটা আপনাদের কোম্পানির। একটা লাম্পপোস্টের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এটা কি উচিত কাজ হয়েছে? ছ মাস আগে এরকম একটা মইয়ের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে অনেক কিছু চুরি হয়ে গেছে!

—চুরি হয়ে গেছে তো থানায় খবর দিন। সেকথা আমাকে কেন?

—এ আপনি কী বলছেন? ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি হলে কেউ কি থানায় খবর দেয়? আপনিই বলুন, আপনি কখনো দিয়েছেন? আপনার বাড়ি থেকে চুরি হয়নি? আমি শুধু বলছিলাম, এই মইটা ফেলে যাওয়ায় চুরির সম্ভাবনাটা একটু বাড়িয়ে-দেওয়া হয়েছে। যে কেউ ঐ মইয়ের সাহায্য নিয়ে চুরি করতে পারে।

ভদ্রলোক এবার একটু নরম হলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, এরকমভাবে রাস্তায় মই ফেলে আসার নিয়ম নেই। মইটা এখানো ওখানে আছে?

—হ্যাঁ আছে। আপনাকে টেলিফোন করতেও দেখতে পাচ্ছি। ওটাকে সরানো যায় না?

কিন্তু এটা তো আমার কাজ নয়। কারুর যদি কারেন্ট ফেইল করে—

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কী করা যায় বলুন তো! চোরের ভয়ে তো আমার আজ সারা রাত ঘুম হবে না।

—আচ্ছা আমি দেখছি, কি করা যায়? এত রাত্রে লোকজন পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবু আমি চেষ্টা করছি, যাতে ওটা সরিয়ে ফেলা যায়। তবে কথা দিতে পারছি না কিছু।

—তা তো বটেই। তবু অনেক ধন্যবাদ।

ফোন রেখে দিলাম। বুঝতেই পারলাম, ভদ্রলোক অসহায়। এত রাত্রে তিনি মই সরিয়ে নিয়ে যাবার লোকই বা পাবেন কোথায়?

আজ আর হাওয়া খাবার লোভ করা চলবে না। রাস্তার দিকের সবকটা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিলাম ভালো করে। তারপর শুয়ে পড়লাম আলো নিবিয়ে।

সহজে ঘুম আসে না। রাত্তির বেলা আপনি আপনি অনেক খুঁটখাট শব্দ হয়। সেই রকম শব্দ হলেই মনে হয়, এই বুঝি চোর এলো! জানলার খড়খড়ি তুলে বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলা যায়! সেইরকম ভাবে যদি চোর এসে জানলা খুলে ফেলে! জানলার পাশেই তো আলনা। উঠে গিয়ে আলনাটা সরিয়ে আনলাম ঘরের মাঝখানে। কিন্তু বইয়ের টেবিলটা তো আর এক জানলার কাছে। কত জিনিস সরাবো?

এক কাজ করলে হয় না? একটা দরজা একটু ফাঁক করে খুলে রাখলে কেমন হয়। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকবো। চোর ব্যাটা যেই ঢুকবে অমনি লাফিয়ে তাকে ধরে ফেলবো। আমি জীবনে কখনো জ্যান্ত চোর দেখিনি। এই একটা সুযোগ!

কিন্তু একজনের বদলে যদি দু তিনটে চোর একসঙ্গে আসে? মই বেয়ে উঠে আসতে আর অসুবিধে কি? কিংবা যদি পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়? থাক, আর দরজা খোলা রাখার বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। তাছাড়া সারা রাত বিছানায় শুয়ে মোটেই আমি জেগে থাকতে পারবো না। চোর আসে আসুক। আমি টুপ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ঘরে চারদিকে চোখ বোলালাম। সব ঠিকঠাকই আছে, চোর আসেনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। মইটা এখনো সেখানেই আছে। তবে রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টও বাল্‌ব নেই। যাক, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে!

পঁচিশ

সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে ছিল খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মন বসলো না। দাঁত মাজতে গিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মুখে দিয়েই থুঃ থুঃ করে উঠলাম। ব্রাশে টুথ পেস্ট লাগাবার বদলে দাড়ি কামাবার ক্রিম লাগিয়ে বসে আছি। যতবার কুলকুচো করি, কিছুতেই আর সাবানের স্বাদটা মুখ থেকে যায় না।

এরপর চা খেতে গিয়ে কাপটা হঠাৎ উল্টে গেল। গরম চা পড়ে গেল পাজামায়। রাগে আমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু কার ওপর রাগ? আসলে আমিই তো অন্যমনস্ক হলে আছ। একটা কিছুতেই মন বসানো দরকার।

ইস্তিরির প্লাগ পয়েন্টটা ক'দিন ধরে খারাপ হয়ে আছি। আজ একটা জামা ইস্তিরি করতেই হবে। প্লাগ সারিয়ে ফেললেই হয়। সেটা তবু একটা কাজ হবে। স্ক্রুড্রাইভারটা নিয়ে এসে সুইচ বোর্ডটা খুলে ফেললাম। একটা তার আলগা হয়ে গেছে। জুড়ে দেওয়া কিছুই না। একটা ছোট কাঠের চৌকির

ওপর সাবধানে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কখন একটা হাত মনের ভুলে দেয়ালে রেখেছি। এমন সময় শক খেলাম, মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। তখন বলে উঠলাম, বেশ হয়েছে! আমার এই শাস্তিই পাওনা ছিল।

পরপর এসবগুলো হচ্ছে শুধু একটিই কারণে। আজ আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। সকালবেলা ঘুম ভাঙবার পর এই কথাটাই প্রথম মনে পড়েছে। কী কঠোর উপলব্ধি! পয়সা নেই, এর থেকে বড় কোনো ঘটনা আর হয় না। তাহলে আজ সারাটা দিন কাটবে কী করে? আজ সাড়ে চারটের সময়—

অনেক ভেবে চিন্তেও কোনো দিক থেকেই টাকা পাওয়ার কোনো উজ্জ্বল আশা দেখা যায় না। সবগুলি উপায়ই বহু ব্যবহৃত হবার ফলে এখন অচল। এমনকি পুরোনো খবরের কাগজ বা শিশিবোতলও বিক্রি করার মতন জমেনি। ধার পাওয়া যেতে পারে অবশ্য। বন্ধুবান্ধবরা এখনো ধার দেয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রথম মুখ ফুটে ধারের কথাটা বলা বড়ই শক্ত! একবার অন্য কথা শুরু হয়ে গেলে আর টাকার কথাটা উচ্চারণ করা যায় না। কতবার এমন হয়েছে, কারুর কাছে ধার চাইতে গিয়ে দু'ঘন্টা গল্প করার পর শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। সেই বন্ধু জানতেও পারেনি, তার রসিকতা শুনে হাসবার সময় আমার ভেতরে কত যন্ত্রণা হয়েছিল।

আজ কিছু টাকা চাই-ই। কিছু না পেলে চলবেই না। আজ সাড়ে চারটের সময়—

দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। আমার জামা-প্যান্ট পরিষ্কার, মসৃণভাবে দাড়ি কামানো, পায়ের চটিজোড়াও প্রায় নতুন। অথচ পকেটে মাত্র কুড়ি পয়সা। কেউ বিশ্বাস করবে? পকেটে দু'চারটে টাকা অন্তত না থাকলে নিজেদের কী মলিন আর নীচু মনে হয়। লোকের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না পর্যন্ত।

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম ডালহৌসিতে। বন্ধুদের মধ্যে অরবিন্দর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবেই। ওর পকেটে না থাকলেও ওর অফিস থেকে টাকা যোগাড় করার একটা রাস্তা আছে। অরবিন্দম আবার টিফিনে বেরিয়ে না যায়।

লিফ্‌টম্যানকে পাওয়া গেল না, পাঁচতলার সিঁড়ি ভেঙে অরবিন্দর অফিসে এসে পৌঁছে গেলাম। এই পরিশ্রমের মূল্য হিসাবেই বোধ হয় অরবিন্দকে ওর টেবিলেই পাওয়া গেল। একটা বই পড়ছিল, আমাকে দেখে বইটা মুড়ে রেখে বললো, তুই এসেছিস? খুব ভালো হয়েছে!

পাছে লজ্জায় বলতে না পারি, তাই আগেই একটা কাগজে লিখে এনেছিলাম। প্রথমেই সেই কাগজটা বাড়িয়ে দিলাম। 'অরবিন্দ, পনেরোটা টাকা চাই। আজই শোধ করে দেবো সামনের মাসে।'

সামান্য দু'লাইনের চিঠি, তবু অরবিন্দ সেটা মন দিয়ে পড়লো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে খুব যত্নের সঙ্গে কুটিকুটি করে ছিঁড়লো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুই বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।

পাঁচ মিনিট বাদে ফিরে এসে অরবিন্দ বললো, চল বেরোই। আমি হাফ-ডে ছুটি নিয়ে এলাম, আর অফিসে ফিরবো না।

যতক্ষণ টাকাটা হাতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বুকের মধ্যে একটু দুরদুর ভাব থাকে। হবে কি হবে না। আজ কি টাকাটা কোনো কারণে....। অরবিন্দর অফিসের এক বেয়ারার কাছ থেকে যখন তখন ধার চাওয়া যায় জানি। আজ যদি সে না এসে থাকে।

অফিসের বাইরে এসে অরবিন্দ বললো, মধুসূদন বেয়ারার কাছে খুচরো টাকা নেই। দিতে চাইছিল না। তাই একটা একশো টাকার নোটই নিয়ে এলাম। তুই পঞ্চাশ। আমি পঞ্চাশ। পাশের দোকান থেকে টাকাটা ভাঙাই আগে।

বেয়ারার কাছে খুচরো পনেরো টাকা নেই, একশো টাকার নোট? এক-একটা বেয়ারাও কত বড়লোক! পাশের দোকান একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে দেয়-সেই বা কম বড়লোক কিসে?

অরবিন্দ গুণে গুণে পঞ্চাশ টাকা আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বললো, চল কিছু খাই! চিকেন আর মোগলাই পরোটা—

আমি বললাম, নারে, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

অরবিন্দ বললো, দামটা আমার টাকা থেকে দেবো, চল না!

—সত্যি আমি বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছি!

ধ্যুৎ! মোগলাই পরোটা-মাংস কি কেউ পেট ভরাবার জন্য খায়? এ তো যখন তখন খাওয়া যায়।

জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকে অরবিন্দ এক গাদা খাবারের অর্ডার দিল। তারপর বললো, আজ সারা দিন একদম মেজাজটা বালো নেই, জানিস?

—কেন?

—কি জানি! এমনিই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। রোজ রোজ সেই একঘেয়ে অফিস, সেই ভিড়ের ট্রাম,-বাস ধরে আসা, সেই একই মানুষজন, ভালো লাগে না। তুই আজ এসেছিস, আজ খুব ভালো হয়েছে! আজ চুটিয়ে আড্ডা দেবো!

আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আজই ইস্, কেন আজ অরবিন্দর কাছে এলাম? এর বদলে অন্য কারুর কাছে গেলেই হতো।

অরবিন্দ বললো, চল, একটা সিনেমা দেখবি।

আমি বললাম, না রে, আমার একটা কাজ আছে। তুই যা না।

—এক একা? একা সিনেমা দেখতে ভালো লাগে? কত ছেলের কত মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার শালা তাও একটাও জোটে না! তোর কী কাজ আছে?

আমাকে একবার সায়েন্স কলেজে যেতে হবে সাড়ে চারটের সময়—

অরবিন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সায়েন্স কলেজে?

বলেই বুঝেছি যে ভুল করেছি। সত্যিই তো, সায়েন্স কলেজে আমার কী দরকার থাকতে পারে? কোথায় বিজ্ঞান, আর কোথায় আমি! ঠিক সম"য় মতন মিথ্যে কথা কিছুতেই আমার মুখে আসে না। অন্য কোনো একটা জায়গায় কথা জানিয়ে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!

অরবিন্দ বললো, ঠিক আছে, চল, আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

আমাদের অপরেশদা তো ওখানে পড়ান, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবো!

আমার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সর্বনাশ, অরবিন্দকে এড়াই কি করে?

আমতা আমতা করে বললাম, আমি ঠিক সায়েন্স কলেজে যাবো না। তার পাশের গলিতে একটা বাড়িতে....খুব জরুরী একটা কাজ....

—ঠিক আছে, তোর কাজটা কতক্ষণ লাগবে?

—বেশিক্ষণ নয়।

আসলে তখনই অরবিন্দকে সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল। তাহলে অরবিন্দ আমাকে ঠিকই ছেড়ে দিতো। কিন্তু রাজ্যের লজ্জা আমাকে ভয় পেয়ে বসলো। সত্যি কথাটা মুখে এলো না।

অরবিন্দ বললো, আমি তোর জন্য দাঁড়াবো। তুই তোর কাজটা সেরে নিবি। তারপর কোথাও বসে দু'জনে একটু গল্প করবো। বললাম না, আজ আমার মেজাজটা একদম ভালো লাগছে না। তুই আজ আমার বাড়ি যাবি? বাড়িতে কেউ নেই, সবাই বেড়াতে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে আমার একলা একলা ফিরতেও ইচ্ছে করে না।

আমি চুপ করে রইলাম। দোকানের ঘড়ির দিকে চোখ। পৌনে তিনটে বাজে। এখনো অনেক দেরি আছে।

বললাম, চল এখন একটু কফি হাউসে যাই। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

কফি হাউসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না। সে রকম কারুকে পাওয়া

গেলে, তার হাতে অরবিন্দকে সঁপে দিতাম। আধ-চেনা ছেলেদের একটা বড় দল বসে আছে একটা টেবিলে। তারা ডাকলো, সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারা সুভাষ বসু সম্পর্কে দারুণ তর্কে মেতেছিল, অবিলম্বে অরবিন্দ সেই তর্কে যোগ দিয়ে বসলো।

তর্ক যখন তুমুল তুঙ্গে উঠেছে, সেই সময় আমি চুপি চুপি উঠে পড়লাম টেবিল থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে যখন নেমে এসেছি, তখনই সিঁড়ির ওপর থেকে অরবিন্দ বিস্মিত ভাবে ডেকে বললো, কি রে, তুই চলে যাচ্ছিস?

আমি মুখ থেকে ধরা-পড়া ভাবটা নিমেষে মুছে ফেলে বললাম, না তো! সিগারেট কিনতে এসেছিলাম!

অরবিন্দ বললো, সাড়ে চারটে বাজতে তো আর দেরি নেই, যেতে হবে না আমাদের? চল্।

নীচে নেমে এসে অরবিন্দ বললো, দূর দূর যতসব বাজে এঁড়ে তর্ক। ছেলেগুলো কিছু বোঝে না কেন যে ওদের সঙ্গে এতক্ষণ বাজে বকতে গেলাম! মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল৷। চল, তোর কাজ সেরে নেবার পর আমার বাড়িতে যাবো৷ছাদের ওপর মাদুর পেতে খুব হাওয়া দেয় ওদিকে...টবে অনেকগুলো জুঁই ফুলের গাছ বসিয়েছি, তুই যদি জিন-টিন খেতে চাস, তাও খাওয়াতে পারি—

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম সায়েন্স কলেজের কাছে। আমার বুক টিপ টিপ করছে। এখনো যদি অরবিন্দকে বলা যায়, এখনো৷। অথচ বলতে পারলাম না।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলো, কোন্ গলিটায় তুই যাবি?

আমি শুকনো মুখে, একদিকে আঙুল তুলে বললাম, ঐ তো—

—আমি আর তাহলে ভেতরে যাবো না। আমি এখানেই দাঁড়াই। কতক্ষণ লাগবে তোর, আধঘন্টা?

আমি ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। ঢুকে পড়লাম গলিতে। কিন্তু গলিতে থাকলে তো চলবে না। ঠিক সাড়ে চারটের সময় সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকের ফুটপাতে বকুল গাছের নীচে আমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সেখানে নীরা আসবে, ওর ছুটির পরে।

প্রত্যেকদিন নীরার সঙ্গে দেখা করা যায় না। ওর এক মাসতুতো দাদাও পড়ে এখানে। সে থাকলে আর আসা হয় না, আমি তার চোখে পড়তে চাই না। যেদিন তার ক্লাস ছুটি থাকে কিংবা কোনো কারণে অনুপস্থিত হয়, সেদিনই নীরার সঙ্গে এখানে আমার দেখা করার কথা থাকে। নীরাদের বাড়িতে হঠাৎ অনেক লোক এসেছে, সেখানে গেলেও নিরিবিলিতে কথা বলার উপায় নেই। আজ প্রায় দশ বারো দিন বাদে নীরার সঙ্গে আমার দেখা হবে৷ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁয় ওকে নিয়ে চা খেতে যাবো।

রাস্তা পেরিয়ে আমি বকুল গাছটার নীচে এসেই দাঁড়ালাম। উল্টোদিকে, বেশ খানিকটা দূরে অরবন্দি একটা মুচির সামনে উবু হয়ে বসে চটি সারাচ্ছে। ভাগ্যিস আমার দিকে পেছন ফিরে বসা!

প্রতিটি মিনিট যেন এক ঘন্টার চেয়েও লম্বা। নীরা এত দেরি করছে কেন? সাড়ে চারটে কি বাজেনি? সায়েন্স কলেজ থেকে কিছু ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি সমস্ত মন প্রাণ দু'চোখের মধ্যে এনে সেদিকে তাকিয়ে আছি। কই, ওদের মধ্যে তো নীরা নেই! নীরা আজ আসেনি? পারে না, নিশ্চয়ই আসবে।

মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি অরবিন্দর দিকে। ও এখনো বসে আছে মুচিটির সামনে। চটি সারাতে কি এতক্ষণ লাগে? নাকি কথা বলার কেউ নেই, ও মুচির সঙ্গেই গল্পে মেতে আছে?

বেশ কিছুক্ষণ পর নীরা বেরুলো। আর কোনো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নয়, একা। এই জন্যই বোধ হয় ও দেরি করছিল। গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরে এসেছে নীরা। আমার দিকে না তাকিয়ে ও একবার তাকালো আকাশের দিকে। ওর সেই গ্রীবার ভঙ্গিতে সমস্ত কলকাতা আলো হয়ে গেল।

নীরা যখন রাস্তা পেরিয়ে আসে তখন সমস্ত ট্রাম বাস ওর সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয় কোনো লোক

চেঁচিয়ে কথা বলে না, কেউ এর সামনে রাস্তায় থুথু ফেলে না।

নীরা আমার কাছে এসে বললো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো? চলো—

আমি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এবার অরবিন্দকে বলতেই হবে, আজ ওর সঙ্গে যেতে পারবো না। কাল নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যাবো।

অরবিন্দ এই সময় উঠে দাঁড়ালো। ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। এগিয়ে এলো কয়েক পা। তারপর থমকে দাঁড়ালো। আমার পাশে নীরাকে দেখে ও কিছু একটা বুঝে নিল। তারপর উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে লাগলো হনহন করে।

আমি অরবিন্দর প্রতি খুব কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। আমাকে আর মুখে কিছু বলতে হলো না। নীরাও জানলো না কিছু। নইলে, অরবিন্দকে দেখে ও হয়তো ভাবতো, আমাদের এই গোপন কথাটা আমি আরও অনেককে বলে দিয়েছি। কিংবা ভাবতো, একদিনও কি আমি বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে ওর জন্য আলাদা সময় দিতে পারি না?

পরমুহূর্তেই দারুণ অনুশোচনা হলো আমার। ছি ছি ছি, এ আমি কী করলাম! আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে টাকা ধার চাইতে গেলেও খুশী হয়, যে পনোরো টাকা ধার চাইলে পঞ্চাশ টাকা দেয়, তাকে আমি এমন ভাবে বিদায় করে দিলাম? তার আজ মন খারাপ, সে আজ আমার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত যত্ন করছিল৷ সে সবের আমি কোনো মূল্যই দিলাম না! শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে একা সময় কাটাবার লোভে? আমার যে-কোনো জিনিস আমি বন্ধুদের ভাগ করে দিতে পারি-তা হলে আজ সন্ধ্যেবেলায় নীরাকে আমি আর অরবিন্দ সুজনে ভাগ করে নিতে পারি না?

নীরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি একটাও কথা বলছো না যে?

আমি বললাম, নীরা, আমার এক বন্ধু এখানে রয়েছে, তাকে ডাকবো? আমাদের সঙ্গে যদি যায়৷

নীরা একটু অবাক, চোখ তুলে বললো, বন্ধু? কোথায়? হাঃ ডাকো৷

অরবিন্দ ছিল রাস্তায় ওপারে। তাকে ধরবার জন্য আমি এমনভাবে ছুটে গেলাম, যে আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়তাম। দু'দিক থেকে গাড়ি প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল আর কি! একজন বাস ড্রাইভার বিশ্রীভাবে গালাগাল দিয়ে উঠলো আমাকে। সে সব অগ্রাহ্য করে আমি ছুটে গেলাম।

কিন্তু রাস্তার ওপারে এসে অরবিন্দকে আর পেলাম না। ও এর মধ্যেই কোনো চলন্ত ট্রামে উঠে পড়েছে।

ছাব্বিশ

আমীর খাঁ সাহেব বললেন, চল বাচ্চা, তোদের এক জায়গা থেকে বহুত আচ্ছা গান শুনিয়ে আনি!

বুঝলাম, খাঁ সাহেব উঠে পড়তে চাইছেন। ঘর ভর্তি লোক, সন্ধের দিকে তিনি বেশ আড্ডার মেজাজে ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে এক অবুঝ ভক্ত বারবার অনুরোধ করছে কেদারার কয়েকটি বিশেষ তান শোনাবার জন্য। অনেকেই বোঝে না যে, শিল্পীদের মানসিক ছুটির দরকার কত বেশী। খাঁ সাহেব ভোরবেলা উঠে প্রায় সারাদিন রেওয়াজ করেন। উৎকৃষ্ট শিল্প মানুষকে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্ত করে দেয়। স্রষ্টাকে ক্লান্ত করে আরও বেশী। সুতরাং সারা দিন চর্চার পর খাঁ সাহেব তো ক্লান্ত হয়ে থাকবেনই। যখন তখন গান গাইতে বললেই কি গাওয়া যায়? তা ছাড়া কিছু আগে তিনি খানিকটা হুইস্কি পান করেছেন। এসব পান করার পর তিনি সচরাচর তারপুরা ছুঁতে চান না।

ভক্তটি তবু নাছোড়বান্দা। ঐ একই অনুরোধ স কাতরে করে যাচ্ছে বারবার। অবশ্য, অনেক ভক্ত এরকম পাগলই হয়।

আমীর খাঁ অতিশয় সজ্জন ও অমায়িক। কারুর মুখের ওপর রূঢ় কথা বলতে পারেন না। বেশ

কযেকবার না না করে তিনি ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছেন। তারপর যেই তিনি উঠে পড়তে চাইলেন, তখনই বোঝা গেল এই উপায়ে তিনি ভক্তটিকে কাটাতে চাইছেন।

একটা পুরোনো ছোট্ট গাড়ি যোগাড় হয়েছে। সেকালের স্ট্যাণ্ডার্ড টেন, অনেকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতন চেহারা। ভেতরে জায়গা খুব কম, আমীর খাঁ সাহেব বেশ লম্বা মানুষ, তাঁ পা ছড়িয়ে বসার খুব অসুবিধে।

সে কথা বলতেই তিনি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, না না, কোনো অসুবিধে নেই! গাড়ি চড়তে পেরেছি এই ঢের! ভারত বিখ্যাত মানুষ, হুকুম করলে ভক্তরা দশটা গাড়ি নিয়ে আসবে এক্ষুনি। সেই লোক এই ভাঙা গাড়িতে চড়েও এরকম কথা বলছেন। ভদ্রতা ও বিনয় এক একজনের মুখে এত সুন্দর হতে পারে।

অবশ্য ছোট গাড়ি হওয়ার একটা সুবিধা হয়েছে। বেশী লোক উঠতে পারে নি, তাঁর সেই নাছোড়বান্দা ভক্তটিও বাদ পড়ে গেছে। আমরা দুতিনজন বন্ধু আগেভাগে উঠে বসে পড়েছি। সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি নিতান্ত তালকানা মানুষ, তবু মাঝে মাঝে আমীর খাঁর কাছে আসি গল্প শোনার লোভে। উনি কথাবার্তাও খুব সুন্দর বলেন। সরল সাদাসিধে দার্শনিকের মতন। এমন কি ওঁর মুখের উর্দুও বেশ সহজে বোঝা যায়।

উনি বললেন, তোমরা জানো না, কলকাতায় যখন থাকতাম আমার যৌবনকালে, বউবাজারে এক বাড়ির দারোয়ানের কাছে একটা খাটিয়া চেয়ে নিয়ে রাত্রে শুতাম। সে খাটিয়াটা এত ছোট, খাটিয়া থেকে আমার পা বেরিয়ে থাকতো। লম্বা হওয়ার অনেক বিপদ।

শুনেছিলাম, গলব্রেথ সাহেব যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, কোথাও বেড়াতে গিয়ে কোনো বাংলাতেই ওঁর মাপ মতন বিছানা পেতেন না। সব সময় পা বেরিয়ে থাকতো। সত্যজিৎ রায়েরও নিশ্চয়ই সেই অবস্থা হয়। অবশ্য গলব্রেথ সাহেবের জন্য পরে অর্ডার দিয়ে আলাদা স্পেশাল খাট বানানো হয়েছিল।

খাঁ সাহেব বললেন, চল, বউবাজারে আমি যে বাড়িটাতে থাকতাম, সেইখানে নিয়ে যাবো।

তাঁর নির্দেশে গাড়ি গিয়ে থাকলো বউবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছাকাছি একট বাড়ির সামনে। এদিককার বাড়িগুলো সব পুরোনো পুরোনো, সরু অন্ধকার প্যাসেজ।

ফুটপাতে একটা ঠ্যালার ওপর একটা বুড়ো মতন লোক বসে ঝিমেচ্ছিল, খাঁ সাহেব তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, ক্যায়সা হ্যায়?

লোকটি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে, বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো খাঁ সাহেবের দিকে। তারপর বললো, আপ?

প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা গিয়ে সিঁড়ি। অন্ধকার। অনেকখানি উঁচুতে একটা বাল্‌ব্ ঝুলছে, কিন্তু তার আলো নীচে পৌঁছয় না। সিঁড়িগুলো বহু লোকের যাতায়াতে প্রায় ক্ষয়ে গেছে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি তো উঠছিই। শেষ নেই যেন। তারপর চারতলায় এসে থামা হলো। খাঁ সাহেবের বয়স তখন ষাটের বেশী, কিন্তু ঋজু সবল চেহারা, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙেও একটুও হাঁপালেন না।

চারতলার বারান্দায় এসে ডাক দিলেন, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

ততক্ষণে বাড়িটা কি ধরনের তা বুঝে গেছি। বিভিন্ন ঘরের দরজায় দেখা যাচ্ছে গালে রুজ মাখা মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে। এবং অনেক ঘরের মধ্য থেকে হারমোনিয়াম ও ঘুঙুরের আওয়াজ। না, এটা বেশ্যবাড়ি নয়। বেশ্যাবাড়ির ঘুঙুর হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যেত গত শতাব্দীতে। এ বাড়িতে গত শতাব্দীরই অন্যরকম ঐতিহ্যের কিছুটা রেশ এখনও রয়ে গেছে।

বারান্দায় একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটির সামনে এসে খাঁ সাহেব আবার ডাকলেন লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

একজন পরিচারক বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেবকে দেখেই লম্বা সেলাম দিল। তারপর অত্যন্ত যত্ন করে দরজার পর্দা সরিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

ঘরটা রীতিমতন বড়। তার অর্ধাংশের কার্পেট ও বাকি অর্ধাংশে পুরু গদি পাতা। বেশ একটা

পরিষ্কার ঝকঝকে ভাব আছে। একটা মস্ত বড় কাচের আলমারিতে প্রত্যেক তাকে শুধু কাচের গেলাস সাজানো। প্রায় একশোটা হবে! এক সঙ্গে এত কাচের গেলাস আমি কোনো বাড়িতে আগে দেখিনি।

এ ঘরেও ডুগি তবল এবং হারমোনিয়াম সাজানো। একটি লোক চুপচাপ বসে আছে, তাকে দেখলেই তবলচি বলে চেনা যায়।

গদির ওপর আমাদের সকলকে বসতে বলে খাঁ সাহেব জানালেন যে, লক্ষ্মী দারুণ গজল গায়। একেবারে বুলবুল। ও আমার মেয়ের মতন। আমি কলকাতায় এলেই একবার ওর গান শুনতে আসি। প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

আমীর খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ খেয়ালী। কোনো অনুষ্ঠানে খেয়াল ছাড়া আমি ওকে ঠুংরি বা ভজন গাইতে শুনিনি। উনিও তাহলে গজল পছন্দ করেন! এবং উনি যখন প্রশংসা করছেন, তখন নিশ্চয়ই দারুণা গায়িকা কখনো নাম শুনিনি অবশ্য।

প্রথমে এলো শরবত। আমাদের প্রত্যেকের জন্য। তারপর একটা রূপোর রেকাবি ভরতি প্রায় ডজন দুয়েক পান। তারপর এলো লক্ষ্মী।

দেখলে মোটেই বাঈজী বলে মনে হয় না। বেশ মোটার দিকে চেহারা, বয়েসেও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। দু'হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, গায়ে একটা বেনারসী শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ।

খাঁ সাহেবের কাছে এসে সে প্রায় শুয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। খাঁ সাহেব বললেন, এই সব বাল-বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

লক্ষ্মী আমাদেরও নমস্কার জানালো বিনীতভাবে।

খাঁ সাহেব গদির ওপর চাপড় মেরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো! এদের এনেছি। একঠো গান শুনাও!

আমাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, খাঁটি সমঝদররাই শুধু লক্ষ্মীর কাছে আসে, ফালতু লোকেরা আসে না।

কিন্তু গানের অনুরোধ শুনে লক্ষ্মী একেবারে হায় হায় করে উঠলো। সে বললো, ওস্তাদজী, আমার কি কপাল! আপনার মতন মানুষ চাইছেন আমার গান শুনতে, আর আমার সৌভাগ্য হবে না! আমার তো আজ গান গাইবার উপায় নেই!

—উপায় নেই? কেন?

—ওস্তাদজী, এটা রোজার মাস! এ সময় তো আমি গান করি না।

খাঁ সাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমাদের দিকে ফিরে আবার বললেন, শোনো মজার কথা। রোজার মাস বলে এ বেটী গান গাইবে না! আরে গাও গাও, কিছু হবে না!

লক্ষ্মী কানে এক হাত দিয়ে জিভ কেটে বললো, আমার ওস্তাদের কাছে কথা দিয়েছি। এ সময় আমি কোনো মেহমানকেও ডাকি না ঘরে।

—তা হলে কি আমাদেরও চলে যেতে বলছো?

লক্ষ্মী খাঁ সাহেবের পা ধরে বললো, সে কি কথা! আপনি কি মেহমান? আপনি আমার গুরুর গুরু। আপনি বসুন, কি খাবেন, বলুন, আমাকে শুধু হুকুম করুন!

—দূর বেটী, তোকে গান গাইতে বললাম, তুই শোনাবি না—

আমার মনে হলো, একটা রূপকথার জগতে এসেছি। এখানকার নিয়মকানুন কিছুই জানি না। লক্ষ্মী যে জাতে হিন্দু, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু সে পবিত্র রোজার মাস উপলক্ষে গান গাইবে না! আর আমীর খাঁ সাহেব ভক্ত মুসলমান, তিনি তাকে পেড়াপীড়ি করছেন গান গাইবার জন্য। সঙ্গীতের জগৎটাই এরকম বিচিত্র।

সে জায়গায় আর কিছুক্ষণ বসে আমরা উঠে পড়লাম। গান শোনা হলো না। লক্ষ্মী অবশ্য বলেছিল, অন্য কোনো ঘর থেকে আর কোনো মেয়েকে ডেকে এনে গান শোনাতে পারে। খাঁ সাহেব রাজী নন্। তিনি যার তার গান শুনবেন না।

বাইরে বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেব বললেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়?

রাত প্রায় সাড়ে দশটা-এগারটা। এখন যাব্যর বিশেষ জায়গা নেই। খাঁ সাহেব নিজেই বললেন, চলো ময়দানে গিয়ে বসা থাক। বিনা পয়সায় কি চমৎকার হাওয়া পাওয়া যায় ময়দানে!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে গিয়ে বসলাম আমরা। সন্ধের দিকে এখানে খুব ভিড় থাকে। এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। কয়েকজন লোক মাত্র বসে আছে এদিক সেদিক। পরিষ্কার আকাশ, ফুটফুট করছে জ্যোস্না, এবং সত্যিই বিনা পয়সার প্রচুর টাটকা বাতাস ওড়াউড়ি করছে সেখানে।

খাঁ সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। মনে হয় যেন ধ্যানস্থ। আমরা কথা বলছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো, প্রকৃতি থেকে যেন একটা গম্ভীর নাদ উঠছে। সচকিতে হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। খাঁ সাহেব সুর ধরেছেন। কেদারা। সন্ধেবেলা যে অনুরোধ তাঁকে করা হয়েছিল, সেটাই বোধহয় মনের মধ্যে ঘুরছিল এতক্ষণ। এখন আপনি আপনি সুর বেরিয়ে এসেছে। আলাপ শুরু করেছেন আদি সপ্তকে, ঠিক বাঘের মতন গলা। না, বাঘের গলায় কোনো সুর নেই, আমি বলতে চাইছি, খাঁ সাহেবের গলায় জোরালো ভাবটা বাঘের মতন।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আমরা এমন সময় অল্প দূরে একটা বিশ্রী বেসুরো শব্দ জেগে উঠলো। তাকিয়ে দেখি যে, খানিকটা দূরে দু'জন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটা হুইস্কির বোতল খুলে বসেছিলেন, তাঁদেরই একজন হঠাৎ নিজে গান গেয়ে উঠেছেন কিংবা খাঁ সাহেবকে ভ্যাঙচাচ্ছেন।

রাগে আমাদের শরীর জ্বলে গেল। খালি গলায় মাঠের মধ্যে বসে আমীর খাঁর গান শোনার মতন দুর্লভ সুযোগ এরা নষ্ট করে দিচ্ছে। ইচ্ছে হলো তক্ষুনি গিয়ে ওদের গলা টিপে দিতে। এর মধ্যে ওরা দু'জনই এক সঙ্গে গান ধরেছে। তারস্বরে খাঁ সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে গান থামালেন। আমরা ঐ লোক দুটোকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য একজন উঠে পড়েছিলাম, খাঁ সাহেব থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে প্রাণের আনন্দে গাইছে, গাইতে দাও!

তারপর তিনিই চেঁচিয়ে বললেন, গাইয়ে, জোর সে গাইয়ে!

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দু'জন এই ঠাট্টা বা কিছুই বুঝলেন না। আরও বেসুরো গলায় চ্যাচামেচি শুরু করলেন। খাঁ সাহেব তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে আমাদের একজনের পিঠে তাল দিতে লাগলেন রীতিমতন। উৎসাহ পেয়ে পাঞ্জাবীদ্বয় আমাদের কাছে উঠে এলেন, তাঁদের গলায় সুর নেই বিন্দুমাত্র, তদুপরি মাতাল অবস্থা, তবু তাঁদের প্রাণের আনন্দের গানে তাল দিতে লাগলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক!

এর কিছুদিন পর, ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম আমীর খাঁ সাহেব একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। প্রত্যেক কাগজে তাঁর ছবি। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল সেই দুই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কি তখনো চিনতে পেরেছেন যে সেই রাত্রে তাঁদের গানের উৎসাহী শ্রোতাটি কে ছিলেন?

সাতাশ

ছেলেটি প্রথমেই এসে আমাকে বললো, আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো!

আমি তক্ষুনি বুঝে গেলাম, চাকরির ব্যাপার। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। পৃথিবীর অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে গেছে যে আমার মতন একজন অভাগা অভাজনের কাছেও কেউ অনুগ্রহ চাইতে আসে। আমার নিজেরই নেই চালচুলো, পকেটে অধিকাংশ সময় হওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সেই আমি কী দিতে পারি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেটির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। রোগা লম্বাটে চেহারা, শ্যামল রং, মলিন ধুতি ও শার্ট পরা। দেখলই অনুমান করা যায় গ্রামের ছেলে। তবে চোখ দুটি ভারী মমতা

মাখানো। মনে হয়, ঐ চোখ দুটিতে আকাঙ্ক্ষা আছে।

আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি, বলো ভাই?

ছেলেটি বললো, আমি আপনার ভরসাতেই কলকাতায় এসেছি। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

আমি তাকে বললাম, বসো, চা খাবে?

চিৎকার করে চায়ের কথা বললাম। ছেলেটিকে খানিকক্ষণ আপ্যায়ন করা দরকার। যাকে আমি চাকরি দিতে পারবো না, তার জন্য কিছুটা সময় অত্যন্ত দেওয়া উচিত। চাকরিও দেবো না, সময়ও দেবো না॥দু'কথায় বিদায় করে দেবো॥এটা কোনো সভ্যতা নয়॥

সে বললো, না, আমি চা খাই না। আমি আপনাকে বেশীক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না। আমি চাকরি চাই না, আপনি শুধু কলকাতা শহরে আমার একটু থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এ দেখছি অন্যরকমের প্রস্তাব। এবার একটু শ্লেষের সঙ্গে বললাম, চাকরি না করেও থাকা খাওয়ার জায়গা যদি পাওয়া যেত, তাহলে সেরকম জায়গা তো আমিই নিতাম!

সে বললো, মানে আমি তো জানিই, চাকরি পাওয়া কত শক্ত। তাই বলছিলাম, খাওয়া থাকার বদলে আমি ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা এরকম কাজও করতে পারি॥আমি শুধু চাই একটা ভদ্র পরিবেশ॥আমি বি-এ পাশ।

কোনো বি-এ পাশ ছেলেকে কেউ বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখে না। তার প্রথম করণ, বি-পাশ চাকর ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার কাজ ঠিকমতন পারবে না। এবং তার স্থায়িত্বের ওপরও নির্ভর করা যাবে না।

আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি সেরকম কোনো বাড়ি জানি না, যেখানে তুমি থাকতে পারো। আমার চেনাশুনোর সবাই মাঝারি মধ্যবিত্ত লোক তাদের বাড়িতে একটা বেশী ঘর পর্যন্ত নেই!

—তা হলে আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে!

ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ছেলেটির সমস্যাটা ঠিক দারিদ্র্যও নয়। ছেলেটি বলেনি যে, ও খেতে পাচ্ছে না। ও বলছে, কলকাতায় ওর থাকার একটা জায়গা চাই।

আমি বললাম, আচ্ছা ভাই, তুমি আত্মহত্যা করবে, এটা কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই আত্মহত্যা করে। কিন্তু সেটা তুমি আমাকে জানিয়ে করতে চাও কেন? আমাকে দায়ী করতে চাও?

—না, না, স্যার আপনাকে দায়ী করবো কেন? আমার শুধু একটা দুঃখ রয়ে গেল, আপনি আমাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। আমি লেখক হতে চাই॥

—লেখক হবার জন্য কলকাতায় থাকতে হবে কেন? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি মেদিনীপুরের এক গ্রামে। বিশেষ কিছুই নেই, তাও বাবা বলেছেন কাজকর্ম দেখতে, ঘরে বসে বসে আমাকে কিছু লিখতে দেখলেই রাগ করেন। আমি স্যার, প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু না লিখে পারি না। না লিখলে আমার মনে হয়, জীবনটাই বৃথা।

আমি একটা সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলাম। এমনও তো হতে পারে, এই ছেলেটি বিরাট প্রতিভাবান লেখক। সত্যিই সুযোগের অভাবে এত বড় প্রতিভা অকালে শুকিয়ে যাবে। একটু দেখে নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার লেখা টেখা কিছু সঙ্গে আছে? একটু দেখতাম। তুমি আত্মহত্যা করলে তো আর সে সুযোগ পাব না!

সে এবার উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, অনেক লেখা আছে। আমার দুটো লেখা ছাপাও হয়েছে। আপনি কোনটা দেখবেন, হাতের লেখা, না ছাপা?

—ছাপাটাই দাও।

কাঁধের ঝোলা থেকে সে একটি অল্পখ্যাত সিনেমার পত্রিকা বার করলো। তার মধ্যে নিজের লেখাটির পৃষ্ঠা খুলে এগিয়ে দিল আমার দিকে। দুটি পৃষ্ঠায় চোখ বোলালাম। আর বেশী পড়বার দরকার নেই। গল্পটি আসলে শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি। অর্থাৎ রামের সুমতি গল্পটাই নাম-টাম বদলে ছাপা হয়েছে। গল্পটার নামও রাখা হয়েছে কুমতি-সুমতি। পত্রিকার সম্পাদকও সেটা খেয়াল করেন নি।

আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এই রকম একটা সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল ওর মুখে স্যার সম্বোধন শুনে। এর আগে যারাই আমাকে স্যার বলেছে, পরে দেখেছি তাদের মাথায় কিছু নেই।

পৃথিবীর অনেক অসুখের মধ্যে লেখার বাতিকও একটা অসুখ। আমাদের দেশের মতন আর্দ্র জলবায়ুর দেশে ঐ রোগের প্রকোপ একটু বেশী। অনেক ছেলেকে আমি দেখেছি, কবিতা লিখতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমি দারুণ লিখছি, অথচ আমার লেখার ঠিক মতন সমাদর হচ্ছে না।এই রকম চিন্তাই হচ্ছে ঐ অসুখের প্রথম লক্ষণ। এই ছেলেটির রোগ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে রামের সুমতিকে এ নিজের গল্প মনে করে বিরাট সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখছে। সাহিত্য জিনিসটা অনেকটা আগুনের মতন, না জেনে ছুঁতে গেলে হাত পুড়ে যাবেই।

আমি পত্রিকাটি ছেলেটির হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম; দেখো সারা জীবনে আমি নিজেও অন্তত তিনবার আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছি, চেষ্টা করেছি। কোনোবারই ঠিক সফল হয় নি। তুমি ঠিক কোন্ উপায়ে আত্মহত্যা করবে বলো তো?

ছেলেটি বললো, আমি সাঁতার জানি না। আমি সমুদ্রের গিয়ে ঝাঁপ দেবো!

আমার বলতে ইচ্ছে করলো, বাঃ আমার শুভেচ্ছা রইলো। দেখি তো, পারো কিনা।

কিন্তু এরকম কথা মুখে বলা যায় না। এ ধরনের শুষ্ক রসিকতা অনেকেই বুঝতে পারে না, মনে করে নিষ্ঠুরতা। সুতরাং নরমভাবে বললাম, আমি অতি সামান্য লোক, আমার কোনো উপায় নেই তোমাকে সুযোগ দেবার। তুমি বরং দেশের বাড়িতেই ফিরে যাও, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দ্যাখো বরং—

ছেলেটি চলে গেল। কিন্তু একটা খোঁচা রেখে গেল আমার মনের মধ্যে। ব্যাপারটা চট করে ভোলা যায় না। ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে মনে হলেও ছেলেটি যদি হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলে! ছেলেটি বোকা, এ ছাড়া আর তো কোনো দোষ নেই। শুধু বোকা হওয়ার জন্য একজনকে মরতে হবে কেন? পৃথিবীতে কি জ্যান্ত বোকার অভাব আছে আর আমিই বা কী এমন দোষ করেছি, যার জন্য আমাকে এ খবর জানিয়ে যেতে হবে?

খবরের কাগজে বড় বড় হরফের খবর ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পড়তাম না। এরপর থেকে ছোট ছোট খবরও পড়তে লাগলাম। তাও খুব সন্তর্পণে। যদি ছেলেটির আত্মহত্যার কোনো খবর ছাপা হয়। মাস চারেকের মধ্যেও সে রকম কিছু চোখে না পড়ায় আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। তা হলে ফাঁড়া কেটে গেছে। দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না।

এরপরই একটা চিঠি পেলাম পুরী থেকে। সেই ছেলেটিই লিখেছে। সম্বোধন করেছে দাদা বলে। যাক, স্যার লেখে নি। সে লিখেছে যে পুরীতে সে এসেছিল আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই, কিন্তু সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল...

ছেলেটি বেশ রোমান্টিক তো। আত্মহত্যার জন্য পুরী চলে গেছে। মেদিনীপুর জেলাতেই তো সমুদ্র পাওয়া যায়, তা তার পছন্দ হয় নি, কোনো বিখ্যাত জায়গা চায়।

যাই হোক, ছেলেটি পুরীর একটি হোটেলে বেয়ারার কাজ নিয়েছে। সারাদিন অসহ্য পরিশ্রম, অন্য বেয়ারারা তার ওপর অত্যাচার করে। মালিক অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়-কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বেশী কষ্ট তো আর নেই, তাই সে লিখেছে, এ সবই সে সহ্য করতে পারছে, শুধু তার একটা অনুরোধ, তার জীবন নিয়ে আমিযেন একটা গল্প লিখি!

মেসের ঝি নিয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু হোটেলের বেয়ারাকে নিয়ে তা কিছু

লেখেন নি। সেই অপরাজেয় কথাশিল্পীই যখন ওকে নিয়ে লিখতে পারেন নি, তখন আমি তো কোন্ ছার। তা ছাড়া গ্রামের চাষাবাস ছেড়ে একটা হোটেলের বেয়ারাগিরি করার মধ্যে কী যে গৌরব আছে, তা বোঝাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

তবু চিঠিটা নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলেটি ভবিষ্যতে কী হবে? আমার মনেরমধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। এক অংশ বললো, হোটেলের ঐ কাজের কষ্ট ছেলেটি বেশীদিন সহ্য করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আবার দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্রের অন্য কোনো কাহিনীর অনুকরণ আবার কিছু লিখে সিনেমা পত্রিকায় পাঠাবে। অথবা ও ঐ হোটেলেরই ম্যানেজার হয়ে উঠবে। দু'বছর সময় ধরা যাক, এর মধ্যে কোনটা হবে? আমি নিজের সঙ্গেই একটা বাজি ধরে ফেললাম। আমার মনের রক্ষণশীল অংশটা বললো, ও ঠিক বাড়িতে ফিরে গিয়ে একদিন বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়ে করে ফেলবে।সাহিত্য বাতিক একেবারে ঘুচবে না, গ্রামের থিয়েটারে শরৎ থিয়েটারে শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ দেবে। অন্য মন বললো, না, না ও যখন একবার বেরিয়ে পড়েছে, আর ফিরবে না, কোনো না কোনোভাবে উন্নতি করবেই। এমন কি নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় একদিন সত্যিকারের লেখক হয়েও উঠতে পারে। রক্ষণশীল মন বললো, কত বাজি? আমি বললাম, দশ টাকা!

আরও দু'এক মাস ছেলেটির চিঠি আসতে লাগলো মাঝে মাঝে। ঐ হোটেল থেকেই নানারকম রোমহর্ষক বর্ণনা। রাত দেড়টায় কাস্টোমার এলে ওকে জাগিয়ে তুলে কত কষ্ট দেওয়া হয়। হেড বেয়ারা কেন ওকে সহ্য করতে পারে না। একজন বেয়ারা জোর করে ওকে একদিন মদ খাইয়ে দিয়েছিল, তার ফলে কী দারুণ কাণ্ড হলো ইত্যাদি।

সব চিঠিই বেশ দীর্ঘ, গোটা গোটা হাতের লেখা, কিন্তু ভাষার কোনো উন্নতি হয় নি। সব সময় একটা কান্না কান্না ভাব। যেন সারা পৃথিবী শুধু ওর ওপর দয়া করবে, ও তাই চায়।

আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে পেয়ে ওর চিঠি লেখা এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ওর কথা ভুলি নি। হঠাৎ আমার মনে পড়ে, কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কোনো সরল মুখের বেয়ারাকে দেখলে আমি দু'এক মুহূর্ত ঐ ছেলেটির কথা ভাবি।

দু'বছর নয়, আড়াই বছরের মাথায় আমাকে একবার পুরী যেতে হলো। আসলে কাজ ছিল ভুবনেশ্বরে, তবু একদিনের জন্য পুরীতে চলে এলাম। হোটেলের নামটা মনে ছিল, সেখানেই উঠলাম। ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না। আমার মনের রক্ষণশীল মন বললো, কী বাজিতে হেরেছ তো? বলেছিলাম না, সে ঠিক বাড়িতে ফিরে যাব?

খানিকটা বাদে ধীরে-সুস্থে অন্য একটি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম ওর কথা। ছেলেটির নাম নাও মিলতে পারে, সে হয়তো এখানে অন্য নাম নিতে পারে। তার চেহারারও বর্ণনা দিলাম।

বেয়াটি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, কানাইয়ের কথা বলছেন তো! সে তো আত্মহত্যা করেছে।

—অ্যাঁ? কবে?

এই তো দু'মাস আগে বিষ খেয়েছিল। কোথা থেকে বিষ পেল তা জানি না। বেশ ঠাণ্ডা মতন ছেলে ছিল।

আমি একটু দমে গেলাম। যাঃ বাজিতে হেরে গেলাম তা হলে?

শুধু আমার মনের কোন্ অংশটা যে কার কাছে হারলো, সেটাই বোঝা গেল না।

আটাশ

—আচ্ছা, আপনাকে কী বলে ডাকবো? নীললোহিতদা, না, শুধু নীললোহিত?

—শুধু নীললোহিত। আর তুমি। আমাকে আপনি বলার দরকার নেই।

—কেন, আপনি তো অনেক বড়ো?

—কে বলেছে আমি বড়ো? আমি সাতাশ বছরে থেমে আছি। এর থেকে আর আমি বড়ো হবো না ঠিক করেছি! আমার বয়েস বছর বছর বাড়তে থাকবে ঠিকই, সেটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু আমি বড়ো আর হবো না। বড় হতে আমার ভাল্লাগে না!

মেয়েটি টেলিফোনে কুলকুল করে হেসে বললো, আমার বয়েস কিন্তু সাতাশ বছরেরও অনেক কম।

আমি বললাম, সেটা তোমার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মেয়েরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী বয়েসের পুরুষদেরও তুমি বলতে পারে।

—মোটেই কেউ তা বলে না।

—হ্যাঁ বলে। মনে করো তোমার সঙ্গে চল্লিশ বছরের কোনো লোকের বিয়ে হলো, তাকেও তো তুমি তুমিই বলবে?

—চল্লিশ বছরের লোককে আমি বিয়ে করতে যাবো কেন? বয়ে গেছে!

—সে কথা তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো না। ধরো যদি উত্তমকুমার তোমাকে বিয়ে করতে চান?

—ধ্যাৎ! যাকগে ওসব কথা। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি, আপনি মার্গারিটকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন॥

—গল্প কোথায়? ওটা তো অনেক বড়। উপন্যাসই বলা যায়।

—সে যাই হোক, ঐ গল্পটা যে লিখেছেন, তা কি সত্যি? মার্গারিট বলে কেউ আছে?

অনেক মেয়েই উপন্যাস টুপন্যাস কিছু বোঝে না। যা পড়ে, সবই তাদের কাছে গল্প। লাইব্রেরিতে গিয়ে তারা ছোট গল্পের বই ও উপন্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে, টুকরো টুকরো গল্প, না টানা গল্প? এটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি।

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ ভাই, সত্যি। একদম সব সত্যি।

—আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল? আপনি সত্যিই ওদেশে গিয়েছিলেন।

আমি যে কখনো বিদেশে ছিলাম, সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। আমার একটাও সুট-টাই নেই, মোজার সঙ্গে বুট জুতার বদলে চটি পরে ঘুরি, আর বার্ডকে ব্যা-র ড, গার্লকে গ্যা-র-ল এই ধরনের উচ্চারণে ইংরিজিও বলতে পারি না। আমার চেহারা একদম ভেতো বাঙালীর মতন। কেউ কেউ বলে গেঁয়ো ভূত।

অচেনা মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ ঠাট্টা ইয়ার্কির পর আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমাকে মার্গারিটের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিল।

মার্গারিটের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার বয়েস সাতাশ। আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বয়েস উনিশ আর সাতাশ। ঐ দু বয়েসে আমি দুটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলাম।

একটা বই খুলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসলো না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো, মার্গারিটের মুখ। সে হাসছে, খানিকটা দুষ্টুমি মেশানো হাসি।

...ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন ছিল পল এঙ্গেলের বাড়িতে। মার্গারেটের নেমন্তন্ন নেই, কারণ পলের স্ত্রী মেরি মেয়েদের তেমন পছন্দ করে না। মেরি খানিকটা পাগলাটে ধরনের, যখন কী রকম ব্যবহার করবে, তার কোনো ঠিক নেই। মার্গারিট সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, তাকে ফেলে একা আমার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া খুব বিশ্রী ব্যাপার। অথচ পলের কাছে মুখ ফুটে মার্গারিটের কথা বলতে পারিনি।

মার্গারিট নিজেই সে সমস্যার সমাধান করে দিল। ওকে গীর্জায় যেতে হবে মধ্যরাত্রির প্রার্থনায় যোগ দিতে। ক্যাথোলিকরা এদিন গীর্জায় যাবেই। তার আগে মার্গারিট ওদের ফরাসী বিভাগের অধ্যাপকের বাড়িতে যাবে একবার। তিনি অবশ্য আমাদের দু'জনকেই নেমন্তন্ন করেছেন। আমি

সেখানটা একবার ঘুরে চলে যাবো পল এঙ্গেলের বাড়ি।

সেটাই হলো। কিন্তু আমি পল এঙ্গেলের বাড়িতে গিয়ে লাভ করলুম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

পল নেমন্তন্ন করেছে মাত্র দশ বারোজন লোককে। শান্ত ছিমছাম পার্টি। অন্যান্য জায়গায় ক্রিসমাসের উৎসবে দারুণ হৈ-চৈ হয়, কিন্তু এখানে আমরা সবাই বসে অল্প অল্প স্কচে চুমুক দিয়ে ম্যারি ম্যাকার্থির সদ্য আলোড়ন তোলা উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করছি। মেরির দেখা নেই।

আমার বেশ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু মেরি না এলে খাবার কে দেবে? এদের বাড়িতে তো আর ঠাকুর-চাকর নেই। অন্যরা আলোচনায় মেতে থাকলেও খাবারের জন্য খানিকটা চাঞ্চল্যও প্রকাশ করছে। লেট সাপারের পক্ষেও দেরি হয়ে গেছে অনেক।

এক সময় পল আমাকে বললো, নীল, দেখো তো মেরি কোথায়? একটু ডেকে আনো না!

মেরির পাগলাটে স্বভাবের জন্য অনেকেই তাকে ভয় করে। কিন্তু মেরি আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। পল সেটা জানে বলেই আমাকে বললো মেরিকে ডেকে আনতে।

বসবার ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেলাম। মেরির শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা, মেরি বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। সামনেই টেলিভিশন সেট।

আমি নরম করে ডাকলাম, মেরি! সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কোনো সাড়া নেই।

আর এক পা এগিয়ে বললাম, মেরি, তোমার কি শরীর খারাপ?

—গো অ্যাওয়ে! লীভ মি অ্যালোন!

এই রে, তার মানে আজ মেরির মেজাজ খারাপ। আর কথা বলার সাহস হলো না, ফিরে এলাম। পলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইশারায় জানালাম ব্যাপরটা। পল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, চলো, আমরা নিজেরাই নিজেদের খাবার নিয়ে নিই।

রান্না ঘরে অনেক রকমের খাবার সাজানো। ওভেনে চাপানো আছে স্টেক, একটু বোতাম ঘুরিয়ে সেটা গরম করে নেওয়া খুব সোজা। সবাই আমরা যে-যার প্লেটে খাবার তুলে নিলাম। আজ এখানে ফ্রায়েড রাইস পর্যন্ত আছে, সম্ভবত আমার সম্মানে।

খাবার প্লেট নিয়ে সবে মাত্র বসবার ঘরে এসেছি এমন সময় মেরির আবির্ভাব। সকলকে ছেড়ে সে আমারই দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো। তারপর কড়া গলায় বললো, তুমি এখানে বসে বসে খাচ্ছো? তোমার লজ্জা করে না?

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী অন্যায় করেছি রে বাবা?

মেরি বললো, আমি এই মাত্র টেলিভিশনে কলকাতার একটা ছবি দেখলাম।। সেখানে হাজার হাজার লোক খেতে পায় না। পথে পথে ভিখিরি। রাত্তিরে সত্তর হাজার লোক রাস্তায় শুয়ে থাকে, এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত! উঃ! ভয়ঙ্কর!

মেরি চোখে হাত দিয়ে কেঁদে ফেললো।

পল উঠে এসে মেরির কাঁধ ধরে খুব কোমল ভাবে বললো, মেরি প্লীজ, আজ ক্রিসমাস...

মেরি এক ঝাটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তোমাদের লজ্জা করে না? কলকাতায় এই মুহূর্তে কত লোক না খেয়ে আছে, আর তোমরা এত খাবার...উঃ, মানুষের এত কষ্ট।আর ঐ ছেলেটা।

মেরি ছুটে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই ছেলেটা।নিজের দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, আর এখানে ও বসে বসে হাসছে? ছি ছি?

মেরি একটা থাপ্পড় লাগালো আমার হাতের খাবারে প্লেটে। সেটা উগে গিয়ে পড়লো বেশ খানিকটা দূরে, ঝনঝন শব্দে ভাঙলো, সমস্ত খাবার ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। তখন পর্যন্ত আমি একটা কিচ্ছু মুখে দিই নি।

তারপর মেরি এমন পাগলামি শুরু করলো যে আর নতুন করে খাবার নেওয়া কিংবা সেখানে

বসে থাকারও কোনো মানে হয় না। পার্টি ভেঙে গেল। সবাই মেরিকে জানে, তার মাঝে মাঝে এরকম হয়। আর একজন অধ্যাপক তাঁর গাড়িতে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি জামা-প্যান্ট না ছেড়েই বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম। মনটা বিষম দমে গেছে। টেলিভিশনওয়ালারা কী পাজি! আজই ঐ কলকাতায় দারিদ্রের ছবি না দেখালে চলতো না? বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। এখন কত জায়গায় কত রকম আনন্দ উৎসব চলছে, আর আমি শুধু ঘরের মধ্যে একা। তাও পেটে অসহ্য খিদে! দূর ছাই!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় খটখট শব্দ হলো। আবার কে এই অসময়? দরজা খুলে দেখি মার্গারিট। মাথায় এলোমেলো সোনালি চুলগুলো একটা স্কার্ফে বাঁধা। ওভারকোটে তখনও বরফের টুকরো জমে আছে। ঘরে ঢুকেই বললো, উঃ, সাংঘাতিক শীত করছে, হাত দুটো জমে যাবে–আমার হাতে হাত দাও শীগগির!

আমি ওর হাতে হাত আর গালে গাল ঘষে দিতে লাগলাম। তারপর ওকে নিয়ে এলাম বিছানায় কম্বলের নীচে।

মার্গারিট বললো, আমি চার্চ থেকে হেঁটে ফিরছিলাম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে চলে এলাম। তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? ক্রিসমাস পার্টি তো ভোর পর্যন্ত চলে?

আমি ওকে সব ঘটনাটা বললাম। মার্গারিট খিলখিল করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, বেশ হয়েছে! যেমন আমাকে না নিয়ে গেছো! খুব নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে তো! আমেরিকানরা এই রকমই ইমোশনাল হয়। হঠাৎ হঠাৎ পরের দুঃখ দেখে প্রাণ একেবারে উথলে যায়। কালকেই সব ভুলে যাবে। কিংবা বড় জোর কুড়ি পঁচিশ ডলার সাহায্য পাঠিয়ে দেবে, ব্যাস তাতেই বিবেক পরিষ্কার হয়ে গেল!

—মাঝে মাঝে হলেও তবু তো ওরা ভাবে।

—চুপ করো, ওটা বড়লোকদের বিলাসিতা।

একটু পরেই মার্গারিট ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বললো, কিন্তু কলকাতায় সত্তর হাজার লোক না খেয়ে থাকলেও আর একজন ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়বে কেন? তাতে কি ওদের কোনো উপকার হবে? আমি এক্ষুনি তোমার জন্য রান্না করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এখন রাত দেড়টা বাজে। বাকি রাতটুকু না খেলেও চলবে।

মার্গারিট কোনো কথাই শুনলো না। সে শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, মঁসিয়ো অ্যাসপেলের বাড়িতে অনেক রকম খাবার খেয়ে এসেছি। আর তুমি না খেয়ে থাকবে? আমি এটা সহ্য করতে পারি?

আমার ভাঁড়ারে খাবার বিশেষ কিছু নেই। ফ্রিজে শুধু খানিকটা কর্নড বীফ বা মাংসের কিমা আর একটা বাঁধা কপি। মার্গারিট উনুনের দুটো মুখ জ্বেলে একটাতে ভাত চাপালো আর একটাতে বাঁধা কপি আর কিমা দিয়ে একটা তরকারি বানিয়ে ফেললো। রাত আড়াইটের সময় সেরকম অপূর্ব সুস্বাদু খাদ্য বোধ হয় আমি জীবনে আর কখনো খাইনি।

এর দু'তিন বাদে মার্গারিট নিজেই একটা পাগলামির কাণ্ড করে ফেললো। দুপুরবেলা আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, মার্গারিট গেছে ওর মাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে। এক সময় দরজার বেল শুনে বুঝলাম, ও ফিরেছে। দরজা খুলে দেখি, ও একা নয়, ওর পেছনে তিনটি প্রায় দৈত্যের মতন চেহারার নিগ্রো।

মার্গারিট তাদের যত্ন করে ঘরে এনে বসালো, তারপর বললো,এঁরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, আমার কাছে রাস্তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। এরা অনেক দূর থেকে আসছেন। খুব ক্লান্ত, তাই আমি এঁদের কফি খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি। ঠিক করিনি?

আমি অবাক। তিন তিনটে জোয়ান লোক রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, তার মানে? এখানে

হাইওয়েগুলির ব্যবস্থাপনা চমৎকর। প্রায় প্রত্যেক মোড়ে মোড়েই নানান জায়গায় নির্দেশ লেখা থাকে–দূরের যাত্রীদের কোনোই অসুবিধ হয় না।

আমি নিগ্রো তিনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন?

একজন অস্পষ্ট ভাবে একটা জায়গার নাম করলো। আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে সোজা বাহাত্তর মাইল গেলে সেখানে পৌছানো যায়। একটু আ্যা ব্রীজের কাছে সে কথা লেখা আছে, চোখ না পড়ে উপায় নেই।

লোকগুলি বেশি কথা বলে না। আমার দিকে এক ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হলো, আমি ওদের দেখে যতটা অবাক হয়েছি, ওরাও আমাকে দেখে তার কম অবাক হয়নি।

ব্যাপরটা অনেকটা বুঝতে পারলুম। ছুটির সময়, অনেকেই বাইরে বেড়াতে গেছে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এই সময় এই তিন নিগ্রো পথের মধ্যে এই একাকী শ্বেতাঙ্গিনী রমণীকে দেখে কুমতলব করেছিল। রাস্তা দেখিয়ে দেবার নামে মার্গারিটকে গাড়িতে তুলতো, তারপর শহর ছাড়িয়ে কোনো নির্জন জায়গায় বলাৎকার ও খুন করে ওর দেহটা মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে যেত। খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই পড়া যায়। মার্গারিটের কফি খাওয়াবার আমন্ত্রণে যে ওরা এসেছে, তার কারণ ওরা মনে করেছিল মার্গারিট একা থাকে। তা হলে ফ্ল্যাটে নিরিবিলিতে কাজটা আরও সুবিধাজনক হয়।

ফ্ল্যাটের মধ্যে একলা মেয়েদের খুন হলে ফ্ল্যাটে নিরিবিলিতে কাজটা আরও সুবিধাজনক হয়।

ফ্ল্যাটের মধ্যে একলা মেয়েদের খুন হবার ঘটনাও এখানে প্রায়ই ঘটে।

লোকগুলোর চেহারা মোটেই সুবিধাজনক নয়। মুখে নিষ্ঠুর ভাব, এই দুপুরেই ওদের গা থেকে কড়া মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে বার বার। আমাকে ওরা একটুও পছন্দ করেনি। ওদের কোটের তলায় পিস্তল বা ছোরাছুরি আছে নিশ্চয়ই। এখন ওরা যদি আমাকে মেরে মার্গারিটকে নিয়ে পালাতে চায়, আমি কী করে বাধা দেবো?

মার্গারিট কফির জল চাপাতে রান্না ঘরে গেছে, আমি সেখানে উঠে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, এদের নিয়ে এলে কেন এখানে?

মার্গারিট বললো, কেন, কী হয়েছে? এরা ক্লান্ত, সারা রাত ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে—

—কিন্তু এরা যদি খারাপ লোক হয়?

মার্গারিট তার সরল নিষ্পাপ মুখখানা আমার দিকে তুলে বললো, কেন খারাপ লোক হবে কেন?

যেন পৃথিবীতে কোনো খারাপ লোক নেই, ওর এই রকম ভাব। আমি আরও কিছু বলতে গেলাম, ও আমাকে বাধা দিয়ে বললো, ওরা সাধারণ শ্রমিক, আমেরিকানরা ওদের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে...

মার্গারিট হয়তো ভেবেছে, আমি খয়েরি দেশের লোক বলে নিগ্রোদের দেখে খুশী হবো। কিন্তু শ্রমিক হলে কি খুনী হতে পারে না? আমেরিকায় অনেক নিগ্রোই নির্যাতিত হয়, আবার অসম্ভব হিংস্র খুনীও আছে ওদের মধ্যে। বিশেষত সাদা মেয়েদের প্রতি ওদের অসম্ভব-লোভ এবং ক্রোধ আছে।

আবার ঘরে এলাম। ওদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। ওরা আমাকে একদমই পছন্দ করেনি, বোঝা যায়। আমি যেন কাবারের মধ্যে হাড্ডি কিংবা গুড়ের মধ্যে বালি। ওরা আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। আমাকে ঠিক কোন্ মুহূর্তে মারবে সেই প্ল্যান করছে!

আমার বাড়ির অন্যান্য আপার্টমেন্ট কেউ নেই। চ্যাঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। কিংবা ওরা যদি উঠে আমাদের দু'জনের মুখ চেপে ধরে তাহলে চ্যাঁচাবারও উপায় থাকবে না। একমাত্র ভরসা টেলিফোন। আমি টেলিফোনে আমার কোনো বন্ধুকে ডাকবার জন্য যেই এগিয়েছি, অমনি একটা নিগ্রো উঠে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় বললো, আমি তোমার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

সে গিয়ে টেলিফোনটা নিয়ে এলোমেলো ডায়াল ঘোরাতে লাগলো। তার মাতাল হাতে বার বার গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম, লোকটি ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছে। এবার আমার রীতিমতন

ভয় করতে লাগলো। আর বোধ হয় কোনো উপায় নেই। ছুরি পিস্তলেরও দরকার হবে না, ওরা খালি হাতেই আমাকে শেষ করে দিতে পারবে।

একটা নিগ্রো সোফার ওপর বসে তার লম্বা ঠ্যাং দুটো বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রেখেছে সামনে। তার একটা জুতোর মুখ ছেঁড়া, হাঁ করা। অচেনা লোকের বাড়িতে গিয়ে কেউ এভাবে বসে না। মার্গারিট ঘরে ঢুকে লোকটিকে সেই অবস্থায় দেখে বললো, আপনি জুতো খুলে ফেলুন না! আরাম করে বসুন!! জুতো খুলে ফেলুন।

লোকটা বিড়বিড় করে বললো, দরকার নেই!

—কেন, খুলে ফেলুন, কোনো লজ্জা নেই। একি, আপনার একটা জুতো ছেঁড়া? কী সাংঘাতিক, এই ঠাণ্ডার মধ্যে! আজই এক জোড়া জুতো কিনুন! এই জুতো নিয়ে বরফের মধ্যে হাঁটলে আঙুল ফ্রাস্ট বাইট হয়ে যাবে! আপনি এক্ষুনি জুতো খুলে ফেলুন, আমি গরম জল আনছি, তাতে পা ডুবিয়ে রাখুন, আরাম হবে! সারারাত এই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে–ছি ছি।

লোকটি আপত্তি করতে লাগলো, মার্গারিট শুনলো না কিছুতেই। গামলায় করে গরম জল এনে লোকটির পায়ের কাছে বসে পড়লো। আর একটু হলে সে নিজেই জুতো খুলে দিত। লোকটি বাধ্য হয়ে গরম জলে পা ডোবালো। আর দু'জন লোককেও মার্গারিট বললো, আপনারাও তো ক্লান্ত, স্নান করবেন? অন্তত মুখ টুখ ধুয়ে নিন, কলে গরম জল আছে, এই নিন তোয়ালে—

শেষ পর্যন্ত লোক তিনটি খারাপ কিছুই করলো না। কফি খেয়ে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকগুলির উদ্দেশ্য খুব খারাপ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা হেরে গেল।

সেদিন মার্গারিটকে দেখে আমি বুঝেছিলাম খাঁটি সরলতা ও সততার কাছে হিংস্রতাও অনেক সময় হেরে যায়!

ঊনত্রিশ

আমার বন্ধু মণীশের বড্ড শখ ছিল বাড়ি থেকে পালাবার। তখন আমরা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ভোরবেলা দু'জনে একসঙ্গে পার্কে বেড়াতে যাই সবুজ দেখবার জন্য। ভোরবেলা সবুজ দেখলে নাকি চোখ ভালো হয়। আমার অবশ্য চোখে যথেষ্ট ভালো, কিন্তু মণীশের ছোটবেলা থেকেই চোখে চশমা।

পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ প্রায়ই বলতো, চল্, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

—কেন, পালাবি কেন?

মণীশ হেসে বলতো, বাড়ির লোককে বেশ কষ্ট দেওয়া হবে। বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি করবে, পুলিশে খবর দেবে, হাসপাতালে যাবে, বেশ মজা হবে! আমি কিন্তু আর ফিরব না। পালাবো মানে একদম পালাবো!

ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। মণীশরা মাঝারি ধরনের বড়লোক। মণীশ বাড়ির আদুরে ছেলে, ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি পড়ে যাবে। মণীশের বাবার দু'তিন রকম ব্যবসা, দারুণ পরিশ্রম করেন, সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তিনি। সপ্তাহের মধ্যে ছদিন।বাবার সঙ্গে মণীশের দেখাই হয় না। এই কারণেই বাবার ওপর মণীশের একটা রাগ ছিল। মণীশ বাড়ি ছেড়ে পালালে ওর বাবা জরুরী সব কাজকর্ম ফেলে যে মণীশের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটবেন।এটাই মণীশের মজা।

কিন্তু আমার তো সে ব্যাপার নয়। আমি অতি সাধারণ বাড়ির ছেলে। আমি চলে গেলে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাবে না। বরং হয়তো, ভাববে, যাক, বাঁচা গেছে! তাছাড়া আমি খুব অল্প বয়েস থেকেই বাড়ি ছেড়ে একা একা চলে গেছি নানান জায়গায় সুতরাং আমার কাছে এর নতুনত্ব কিছু নেই।

মণীশ তবু প্রায়ই আমাকে বলে, চল পালাই, চল পালাই!

আমি ওকে বলি, তাহলে তুই একাই পালিয়ে যা না। বাড়ি থেকে পালাবার সময় একা যাওয়াই তো নিয়ম?

মণীশ বলে, দূর, তা ভাল্লাগে না! একা গেল কথা বলার কোনো লোক পাব না! তুই চল।

—কেন, যেখানে যাবি, সেখানেই অনেক লোকের সঙ্গে ভাব হবে।

—আমার একদম নতুন লোকের সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে না! তা ছাড়া ধর, যেখানেই যাবো, সেখানে নিশ্চয়ই প্রায়ই সাইকেল রিকশা ভাড়া করতে হবে! দু'জনে সাইকেল রিকশা চাপলেও যা ভাড়া, একজন চাপলেও সেই একই ভাড়া। তাহলে শুধু একজন যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

মণীশের এই অদ্ভুত যুক্তি আমি বুঝতে পারি না।

একদিন সকালবেলা পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ বলল, চল, শিয়ালদা স্টেশনে যাই। আজই পালাবো!

আমি বললাম, ধুৎ! সঙ্গে টাকা পয়সা কিছু নেই, পালাবো কি করে?

মণীশ বললো, আমার কাছে আছে, এই দ্যাখ।

মণীশ পকেট থেকে এক গাদা টাকা বার করে দেখালো। সবসুদ্ধু তিনশো টাকা। তখন আমাদের কাছে তিনশো টাকা মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কলেজে যাবার সময় বাস ভাড়া ও জলখাবারের জন্য রোজ আট আনা করে পাই। আর মণীশের পকেটে জলজ্যান্ত তিনশো টাকা! বললাম, চল!

হাওড়ার বদলে শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়াই আমাদের প্রথম ভুল। হাওড়া থেকে অনেক দূর পাল্লারা ট্রেন ছাড়ে। শিয়ালদার অধিকাংশ ট্রেনই কাছাকাছি জায়গার। তা ছাড়া, শিয়ালদা স্টেশন তখন এত নোংরা আর রিফিউজিতে ভরা যে একটুক্ষণও সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে ট্রেন, মণীশ সেটাতেই উঠে পড়তে চায়। আমরা পেলাম ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন।

সেটা ছুটির দিন নয়, সপ্তাহের মাঝামাঝি, এরকম দিনে কেউ ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে যায় না। হকার, ফড়ে আর মলিন মানুষে কামরা ভর্তি, চকচকে প্যান্ট সার্ট পরা শুধু আমরা দু'জন। মণীশ এর আগে কখনো বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ছাড়া কোথাও যায় নি। ও এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে, মুখ চোখে এমন অস্থিরতা যে কেউ একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, আমরা বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। অবশ্য সে রকম লক্ষ্য করে দেখবার মতন কেউ ছিল না।

আমি এর আগে ডায়মণ্ডহারবার দু'বার গেছি। অর্থাৎ আমার চেনা জায়গা। চেনা জায়গায় কেউ পালায় না। সুতরাং ডায়মণ্ডহারবারে নেমে আমরা আবার কাকদ্বীপের বাস ধরলাম।

কাকদ্বীপে পৌঁছে দেখা গেল, সেটা মোটেই দ্বীপ নয়। এমনিই একটা ছোটখাটো শহর-বাজার জায়গা। নামটা আমাদের ঠকিয়েছে। সেইজন্যই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হলো না। সেখান থেকে আবার বাসে চেপে চলে এলাম নামখানায়। এবার বেশ অনেকটা দূর আসা গেছে । এবার এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যায়।

নামখানা জায়গাটা ছোট হলেও বেশ একটা বন্দর-বন্দর ভাব আছে। জাহাজ নয়, নৌকার বন্দর। নদীর এপারে থেমে আছে অনেকগুলোবেশ বড় বড় নৌকা। ঘাটের কাছে গেলেই লাইন বাঁধা অনেকগুলো হোটেল; বেছে টেছে আমরা একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। দুপুর হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব।

হোটেল ঘরের মেঝেতে যেন একটি জ্যান্ত কার্পেট পাতা। এত অসংখ্য মাছি যে সেইরকমই মনে হয়। ভেতরে পা দিলেই কিছু মাছি উড়ে গিয়ে শুধু পা ফেলার জায়গা করে দেয়। প্রত্যেক টেবিলে রয়েছে কয়েকটা হাত পাখা। খাবার সময় এক হাতে পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াতে হয়। ফ্লিট বা অন্য কিছু দিয়ে মাছি তাড়াবার কথা এখানে কেউ চিন্তাও করে না।

খাওয়াটা কিন্তু দারুণ জমলো। গরম গরম মোটা চালের ভাত, বিউলির ডাল আর আলুভাজা, পার্শে মাছ ভাজা। তারপর ভেটকি মাছের ঝোল, তারপর চিংড়ির মালাইকারি। মণীশ আমার তুলনায় অনেক ভোজন রসিক। সে এর পরও নিল একটা প্রকাণ্ড কাৎলা মাছের মুড়ো। সেই আস্ত মুড়োটার চেহারা রীতিমতন ভয়াবহ। মণীশ কিন্তু বেশ সুচারুভাবে সেটা খেয়ে ফেললো। আমাদের বিল হলো সতেরো টাকা। এই রেটে চললে আমাদের তিনশো টাকা খুবই স্বল্পজীবী হবে।

রাত্রে থাকার জায়গাটা আগেই ঠিক করে রাখা দরকার। মণীশ হোটেলের মালিককে জিজ্ঞেস করলো, এখানে রাত্তিরে কোথায় থাকা যায় বলতে পারেন?

হোটেলের মালিক আমাদের দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকালো। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, রাত্তিরে এখানে থাকবেন? কেন?

মণীশ বেপরোয়াভাবে বললো, এমনিই! ইচ্ছে হয়েছে, তাই থাকবো!

মালিক বললো, ডাক বাংলো আছে, কিন্তু সেখানে তো এখন জায়গা পাবেন না। কাল থেকে এক মিনিস্টারা তাঁর পার্টি নিয়ে সেখানে আছেন।

—আর কোনো জায়গা নেই?

—জায়গা আছে, আমার এখানেই আছে। কিন্তু সেখানে আপনারা থাকতে পারবেন না। আপনারা ভদ্দরলোক।

যেন ভদ্দরলোক কথাটা একটা গালাগাল, সেইভাবে উচ্চারণ করলো হোটেলের মালিক। আমরা চটে গেলাম। মণীশ কড়া গলায় বললো, কে বলেছে আমরা ভদ্দরলোক? আমাদের গায়ে লেখা আছে? কোথায় আপনার জায়গা দেখান।

—ওপরে আমার রুম আছে। সেখানে দেড় টাকা করে খাট ভাড়া পড়বে।

আমরা সেটা দেখতে গেলাম। হোটেল বাড়িটা পাকা নয়, মাঠকোঠা তবু তারও দোতলা আছে। ওপরের ঘরটা বেশ বড়, সেখানে আটখানা খাট পাতা, সঙ্গে তোষক আর বালিশ। ঘরের জানলা দিয়ে নদী দেখা যায়। আমাদের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। টাকা অ্যাডভান্স করে দিলাম। তক্ষুনি। জানলার ঠিক নীচেই একটা টিউব ওয়েল, সেখানে স্নান করছে একটি মেয়ে। স্বাস্থ্যটি ভালো, বেশ চমকানো চেহারা। যাক, এখানে থাকলে তাহলে কিছু সৌন্দর্য চর্চাও করা যাবে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নদী পেরিয়ে আবার বাসে করে ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু তিনদিন ধরে কী কারণে যেন বাস বন্ধ। সুতরাং ওদিকে আর যাওয়ার উপায় নেই।

নৌকোর ঘাটে একটা পাগলকে নিয়ে অনেকে মস্করা করছে। পাগলটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গলায় আবার একটা সাপ জড়ানো। মস্ত বড় সাপ। এদিকে সাপ প্রচুর। আমরা কাকদ্বীপ থেকে বাসে করে আসার সময়ই দেখেছিলাম, একটি বিশাল সাপ হেলে দুলে রাস্তা পার হচ্ছে। বাস ড্রাইভার কিন্তু সাপটাকে চাপা দিল না। বাস থামিয়ে সাপটাকে রাস্তা পার হবার সময় দিল। এরা চট্ করে সাপ মারে না। পাগলটা সাপটাকে দিব্যি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা একটা নৌকো ভাড়া করলাম। নৌকোর মাঝিরা এখন অলস। বড় বড় নৌকো ছাড়বে শেষ রাত্রে, তখন জোয়ার আসবে। এইসব নৌকো যাবে সুন্দরবনে, আবার উল্টো দিকে খুলনার দিকেও যাওয়া যায়।

নৌকো করে বেড়াতে বেড়াতে মনে হলো, আমরা সত্যিই মুক্ত, স্বাধীন। কোনো অভিভাবকের চোখ রাঙানি নেই। হু হু করছে হাওয়া, কাছেই সমুদ্র। আমরা ইচ্ছে মতন যেখানে খুশী যেতে পারি। ঘন্টাখানেক নৌকো করে এগোবার পরই কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যায়। কোনো কোনো দ্বীপে গাছপালা, মানুষজনও আছে, কোনো দ্বীপ একেবারে ফাঁকা।

আমি মণীশকে বললাম, এরকম একটা ফাঁকা দ্বীপের তো আমরা থেকে যেতে পারি? কী বল্!

মণীশ চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সেখানে বসে তুই শুধু কবিতা লিখবি?

—লিখলেই বা ক্ষতি কি?

চ্যাঁচামেচি কারতে লাগলো। অন্য খাট থেকে একজন ঘুম জড়ানো গলায় বললো, আঃ মশাই, চুপ করুন না!

সারারাত আমরা ঘুমোতে পারলুম না একেবারে! তখনই বুঝতে পারলুম, হোটেলের মালিক কেন আমাদের ভদ্দরলোক বলে ঠাট্টা করেছিল। অন্য লোকগুলি তো ঐ ছারপোকার কামড় খেয়েও দিব্যি ঘুমিয়েছিল নাক ডাকিয়ে।

চা-টা খেয়ে আমরা বাইরে বেড়াতে এলাম। মণীশ আর আমার দু'জনেরই সারা গা ছারপোকার কামড়ে ফুলে গেছে। চোখ লাল করকরে। তবু নদীর টাটকা হাওয়ায় একটু ভালো লাগে। ঘাট আজ অনেক ফাঁকা, বেশীর ভাগ নৌকাই শেষ রাতে ছেড়ে গেছে। কিছু নতুন নৌকো আসছে।

ঘাটের কাছে এক জায়গায় কিছু গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে কিন্তু কালকের সেই পাগলটি নয়, একটি ন'দশ বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি ইজের পরা, খালি গা, কাঁদছে। কান্না শুনলেই বোঝা যায়, ছেলেটি কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে।

ভিড়ের লোকরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ ছেলেটির কান্না থামাতে চাইছে না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই আমরা কারণটা বুঝতে পারলাম। ছেলেটিকে তার বাড়ির লোক ইচ্ছে করে এখানে ফেলে চলে গেছে। শুনলাম এরকম ঘটনা মাঝে মাঝেই হয়। সুন্দরবনের কোন্ দূর গ্রামে ওর বাড়ি, ওদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে, বাবা-মা সবাইকে খেতে দিতে পারে না। তাই কুকুর বিড়াল পার করবার মতন ছেলেটিকে এত দূরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, যাতে আর ফিরতে না পারে। এখন কে এই ছেলেটির ভার নেবে? আজকালকার দিনে কেউ নিতে চায় না। কেউ ছেলেটির হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ডুকরে উঠছে।

আমি আর মণীশ চোখাচোখি করলাম। মণীশের মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। আমার বুকটা কাঁপছে, কেন জানি না।

বলাই বাহুল্য,সেই তিনশো টাকা ফুরোবার আগেই আমরা দু'জনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বিশেষত ঐ ছারপোকার অত্যাচারেই আমাদের বেশী মনমরা করে দিয়েছিল। আমাদের দু'জনের বাড়িতে অবশ্য অভ্যর্থনা হয়েছিল দু'রকম। মণীশ যে নিজের থেকেই আবার ফিরে এসেছে, এতেই তার বাড়ির লোক এত খুশী হয়ে গেল যে তাকে একটুও বকুনি দিল না, বরং তার আদর যত্ন বেড়ে গেল। আর আমি, বাড়ির লোককে অকারণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলাম বলে, বাবার হাতে প্রচণ্ড মার খেলাম। সে যাকগে, এমন কিছু নয়, ওরকম মার তো আমি কতই খেয়েছি।

কিন্তু তারপরে যতবারই আমাদের ঐ ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কথা ভেবেছি, ততবারই মনে পড়েছে সেই ইজের পরা ছেলেটির কথা। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছেলেটি, মা-আ-আ বলে কাঁদছিল, কী অসম্ভব করুণ সেই আর্তনাদ? আমরা শখ করে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিলাম, আর ঐ ছেলেটিকে তার বাড়ির লোকই ফেলে পালিয়েছে!

—ঃ সমাপ্ত ঃ—